Colonial economy and patterns of exploitation

ঔপনিবেশিক শাসন কেবল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক শোষণের কাঠামো। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দী ধরে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতের সম্পদ যেভাবে নিষ্কাশন করেছে, তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ছিল মাতৃদেশের (ব্রিটেন) সমৃদ্ধি সাধন এবং উপনিবেশকে (ভারত) কাঁচামালের জোগানদার ও পণ্যের বাজারে পরিণত করা।

১. শোষণের প্রাথমিক পর্যায়: লুণ্ঠন ও একচেটিয়া বাণিজ্য (১৭৫৭-১৮১৩)

পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলে শোষণের প্রথম পর্যায় শুরু হয়। এই সময়টিকে অনেক ঐতিহাসিক "প্লাসি প্লান্ডার" বা পলাশীর লুণ্ঠন বলে অভিহিত করেছেন।সম্পদ পাচার: কোম্পানি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং উপঢৌকনের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাংলা থেকে ব্রিটেনে নিয়ে যায়।একচেটিয়া বাণিজ্য: দস্তক বা বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার অপব্যবহার করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কোণঠাসা করা হয়। তাঁতি ও কারিগরদের ওপর জোরপূর্বক কম মূল্যে পণ্য বিক্রিতে বাধ্য করা হতো।

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা: ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কৃষকদের ওপর রাজস্বের বোঝা অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সূর্যাস্ত আইনের ভয়ে জমিদাররা কৃষকদের ওপর চরম নির্যাতন চালাত, যার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে।

২. শিল্প বিপ্লব ও অবাধ বাণিজ্য নীতি (১৮১৩-১৮৫৮)

ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার পর শোষণের ধরণ বদলে যায়। ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে কোম্পানির বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার শেষ হয় এবং ব্রিটিশ পণ্য ভারতের বাজারে অবাধে প্রবেশের সুযোগ পায়।বি-শিল্পায়ন (De-industrialization): উন্নত ব্রিটিশ যন্ত্রজাত সস্তা কাপড়ের সামনে ভারতের ঐতিহ্যবাহী মসলিন ও তাঁত শিল্প টিকতে পারেনি। শুল্ক বৈষম্যের মাধ্যমে ভারতীয় রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়, অথচ ব্রিটিশ পণ্য নামমাত্র শুল্কে ভারতে ঢুকতে থাকে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ কারিগর বেকার হয়ে কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।কাঁচামাল রপ্তানি: ভারত পরিণত হয় তুলা, নীল, পাট এবং চা-এর মতো কাঁচামাল রপ্তানিকারক দেশে। ব্রিটিশ কলকারখানার প্রয়োজন মেটাতে খাদ্যশস্যের বদলে অর্থকরী ফসল চাষে কৃষকদের বাধ্য করা হয়।

৩. আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজি বিনিয়োগ (১৮৫৮-১৯৪৭)

১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার সরাসরি ব্রিটিশ রাজমুকুটের অধীনে চলে গেলে শোষণের নতুন রূপ দেখা দেয়। এই পর্যায়ে সরাসরি লুণ্ঠনের চেয়ে "পুঁজি বিনিয়োগের" মাধ্যমে শোষণ বেশি কার্যকর হয়।রেলপথ ও অবকাঠামো: ব্রিটিশরা ভারতে রেলপথ নির্মাণ করে মূলত ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের স্বার্থে এবং ভারতের অভ্যন্তর থেকে কাঁচামাল দ্রুত বন্দরে পৌঁছানোর জন্য। এই বিনিয়োগের ওপর ৫ শতাংশ নিশ্চিত লভ্যাংশ ভারতীয় কোষাগার থেকে দেওয়া হতো।হোম চার্জেস (Home Charges): ভারত সচিবের কার্যালয়ের ব্যয়, ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের পেনশন, যুদ্ধের খরচ এবং ঋণের সুদ—এই সবকিছুই ভারতের রাজস্ব থেকে মেটানো হতো। একে বলা হয় 'অদৃশ্য রপ্তানি', যা ভারতের সম্পদ শোষণের অন্যতম বড় হাতিয়ার ছিল।

উপনিবেশবাদের মূল ভিত্তিই ছিল অর্থনৈতিক শোষণ। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, বরং এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সম্পদ নিষ্কাশন (Drain of Wealth) করে ব্রিটেনের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে, তখন থেকেই ভারতীয়

অর্থনীতির চরিত্র বদলাতে শুরু করে। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কৃষি ও কুটির শিল্পনির্ভর অর্থনীতি রাতারাতি রূপান্তরিত হয় ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং উৎপাদিত পণ্যের একচেটিয়া বাজারে। নিচে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি এবং এর শোষণের বিভিন্ন দিক ও পর্যায়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. ঔপনিবেশিক শোষণের বিভিন্ন পর্যায়

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রজনী পাম দত্ত তাঁর 'ইন্ডিয়া টুডে' গ্রন্থে ভারতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক শোষণকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন:

ক. বাণিজ্য পুঁজির পর্যায় (১৭৫৭ - ১৮১৩)

এই পর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লাভ করা এবং ভারতের রাজস্ব ব্যবহার করে এদেশেরই পণ্য কেনা (যাকে 'ইনভেস্টমেন্ট' বলা হতো) এবং তা ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করা। এর ফলে ভারত থেকে কোনো সোনা বা রুপো আমদানি করতে হতো না কোম্পানিকে, বরং বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব দিয়েই তারা ব্যবসা চালাত। এটি ছিল সরাসরি লুণ্ঠনের যুগ।

খ. শিল্প পুঁজির পর্যায় (১৮১৩ - ১৮৫৮)

১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানির বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার অবসান ঘটে এবং মুক্ত বাণিজ্যের সূচনা হয়। এই সময়ে ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। ফলে ভারতের ভূমিকা বদলে যায়। ভারত এখন আর তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ রইল না, বরং তা পরিণত হলো ব্রিটেনের কারখানায় তৈরি সুতি বস্ত্রের বিশাল বাজারে এবং নীল, তুলা ও পাটের মতো কাঁচামালের প্রধান সরবরাহকারীতে।

গ. আর্থিক পুঁজির পর্যায় (১৮৫৮ - ১৯৪৭)

১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার সরাসরি ব্রিটিশ ক্রাউনের হাতে যাওয়ার পর শোষণের নতুন রূপ দেখা দেয়। এই পর্বে ব্রিটিশ পুঁজি ভারতে বিনিয়োগ করা শুরু হয়—প্রধানত রেলপথ নির্মাণ, চা-বাগান, পাটকল এবং ব্যাংক খাতে। এই বিনিয়োগের পেছনে মূল আকর্ষণ ছিল ভারত সরকারের দেওয়া নিশ্চিত মুনাফার গ্যারান্টি (Guaranteed Interest)। এই পর্বের শোষণ ছিল সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং গভীর।

২. ভূমি রাজস্ব নীতি এবং কৃষকদের ওপর শোষণ

ব্রিটিশরা ভারতে আসার পর তাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমির রাজস্ব। রাজস্ব আদায়কে নিশ্চিত এবং সর্বোচ্চ করার জন্য তারা প্রথাগত ভারতীয় ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩): লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এর ফলে জমিদাররা জমির স্থায়ী মালিক বনে যান এবং কৃষকরা নিজেদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে সাধারণ রায়তে পরিণত হন। জমিদারদের ওপর করের বোঝা এতটাই নির্দিষ্ট এবং কঠোর ছিল যে, সূর্যাস্ত আইনের ভয়ে জমিদাররা কৃষকদের ওপর অমানষিক অত্যাচার চালিয়ে খাজনা আদায় করত।

রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী ব্যবস্থা: দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে রায়তওয়ারী এবং উত্তর ভারতে মহলওয়ারী ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলোতে সরাসরি সরকারের পক্ষ থেকে অত্যন্ত চড়া হারে (কখনও কখনও উৎপাদনের ৫০% থেকে ৬০%) খাজনা নির্ধারণ করা হতো।

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ: ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতীয় কৃষকদের খাদ্যশস্য চাষের পরিবর্তে জোর করে নীল, আফিম, তুলা ও পাট চাষ করতে বাধ্য করা হয়। এর ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস

পায় এবং কৃষকরা সম্পূর্ণভাবে বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থার করাল গ্রাসেই ১৭৭০ সালের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এবং ১৯৪৩ সালের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) পঞ্চাশের মন্বন্তরের মতো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়।

৩. দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন বা অবশিল্পায়ন (De-industrialization)

ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতের মসলিন, রেশম এবং সুতি বস্ত্রের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের বৈষম্যমূলক শুল্ক নীতি এবং আধুনিক যন্ত্রশিল্পের অসম প্রতিযোগিতায় ভারতের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

একতরফা মুক্ত বাণিজ্য (One-way Free Trade): ব্রিটিশ সরকার ভারতের তৈরি পণ্যের ওপর ব্রিটেনে প্রবেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চ হারে (প্রায় ৭০-৮০%) আমদানি শুল্ক চাপায়। অন্যদিকে, ব্রিটেনের কারখানায় তৈরি কাপড়ের জন্য ভারতের বাজার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং নামমাত্র শুল্ক নেওয়া হয়।

তাঁতি ও কারিগরদের ওপর অত্যাচার: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দাদনি প্রথার মাধ্যমে তাঁতিদের অগ্রিম টাকা নিতে বাধ্য করা হতো এবং সস্তা দরে কাপড় দিতে বাধ্য করা হতো। অনেকে এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে নিজেদের হাতের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত কেটে ফেলেছিলেন।

শহুরে অবক্ষয়: ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, সুরাটের মতো সমৃদ্ধ শিল্পনগরীগুলো রাতারাতি জনশূন্য ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। কারিগর ও শিল্প শ্রমিকরা জীবিকার সন্ধানে গ্রামে ফিরে গিয়ে কৃষির ওপর চাপ বাড়িয়ে দেয়, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও ভঙ্গুর করে তোলে।

৪. সম্পদের নিষ্কাশন (Drain of Wealth)

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সবচেয়ে মারাত্মক দিক ছিল 'সম্পদের নিষ্কাশন'। দাদাভাই নওরোজি তাঁর বিখ্যাত ‘Poverty and Un-British Rule in India’ গ্রন্থে এই তত্ত্বটি তুলে ধরেন। তাঁর মতে, ভারতের সম্পদের একটি বিশাল অংশ প্রতি বছর ব্রিটেনে চলে যেত, যার বিনিময়ে ভারত বস্তুগত বা অর্থনৈতিক কোনো সুবিধাই পেত না।

এই নিষ্কাশন মূলত ঘটত কয়েকটি মাধ্যমে:

১. হোম চার্জেস (Home Charges): ব্রিটেনে অবস্থিত ভারত সচিবের অফিসের খরচ, সেনা কর্মকর্তাদের পেনশন এবং ভারত সরকারের নেওয়া ঋণের সুদ মেটাতে ভারতীয় রাজস্বের একটা বড় অংশ লন্ডনে পাঠানো হতো।

২. ব্যক্তিগত মুনাফা: ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ কর্মকর্তা, বিচারক এবং সেনা সদস্যদের বেতন ও সঞ্চিত অর্থ তারা নিজ দেশে পাঠিয়ে দিতেন।

৩. যুদ্ধের খরচ: এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বা বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যে সামরিক অভিযান চালানো হতো, তার সমস্ত খরচ বহন করতে হতো ভারতীয় করদাতাদের।

রোমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর ‘Economic History of India’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ভারতের মোট রাজস্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতি বছর কোনো প্রতিদান ছাড়াই দেশ থেকে বাইরে চলে যেত, যা ভারতকে ক্রমান্বয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে তুলেছিল।

৫. আধুনিক অবকাঠামো ও রেলপথের আসল চরিত্র

লর্ড ডালহৌসি ভারতে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। আপাতদৃষ্টিতে একে আধুনিকীকরণ মনে

হলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক ও শোষণমূলক।

কাঁচামাল পরিবহন ও বাজার সম্প্রসারণ: রেলপথের মূল নকশা এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে ভারতের অভ্যন্তরীণ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সহজে কাঁচামাল বন্দরগুলোতে নিয়ে যাওয়া যায় এবং বন্দর থেকে ব্রিটিশ পণ্য ভারতের গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া যায়। ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হয়নি।

সামরিক কৌশল: কোনো অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলে যাতে দ্রুত ব্রিটিশ সেনা পাঠানো যায়, রেলপথের রুট তৈরিতে সেই সামরিক গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

লুণ্ঠনের নতুন হাতিয়ার: রেলপথ নির্মাণে যে বিশাল পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছিল, তা ছিল ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের। ভারত সরকার তাদের ৫% নিশ্চিত মুনাফার গ্যারান্টি দিয়েছিল। এই লোকসানের বোঝা শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জনগণের ওপর করের মাধ্যমে চাপানো হতো।

শোষণের বিভিন্ন কৌশল ও ধরণ

ঔপনিবেশিক শোষণের প্রক্রিয়াটি ছিল বহুমাত্রিক। নিচে এর প্রধান দিকগুলো আলোচনা করা হলো:

ক. ভূমি রাজস্ব ও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ

ব্রিটিশরা কৃষিকে কেবল রাজস্ব আদায়ের উৎস হিসেবে দেখত। নীল চাষের মতো বাধ্যতামূলক চাষাবাদ কৃষকদের ঋণের জালে আবদ্ধ করে ফেলে। মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব পরিশোধ করতে গিয়ে কৃষকরা মহাজনদের খপ্পরে পড়ত, যা গ্রামীণ দারিদ্র্যকে স্থায়ী রূপ দেয়।

খ. সম্পদের বহির্গমন (Drain of Wealth)

দাদাভাই নওরোজি তাঁর 'Poverty and Un-British Rule in India' গ্রন্থে এই তত্ত্বটি তুলে ধরেন। ভারত থেকে প্রতিবছর যে পরিমাণ সম্পদ ব্রিটেনে যেত, তার বিনিময়ে ভারত কোনো অর্থনৈতিক সুবিধা পেত না। এই সম্পদের বহির্গমনই ছিল ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের মূল কারণ।

গ. মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা

ব্রিটিশরা মুদ্রা ও বিনিময় হারের এমন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত যা ব্রিটিশ পাউন্ডের জন্য সুবিধাজনক ছিল। ভারতীয় ব্যাংকগুলো মূলত ব্রিটিশ পুঁজি ও স্বার্থ রক্ষা করত, দেশীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কোনো সহায়তা দিত না।

৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

ঔপনিবেশিক এই শোষণ কাঠামোর ফলাফল ছিল ভয়াবহ:

১. দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি: ১৭৭০ সালের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে শুরু করে ১৯৪৩ সালের পঞ্চাশের মন্বন্তর—ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতির ফলে বারবার দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে। খাদ্যের বদলে রপ্তানিযোগ্য শস্য চাষ এবং ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

২. দারিদ্র্যের স্থায়ী রূপ: ভারতের মাথাপিছু আয় স্থবির হয়ে পড়ে। একসময়ের "সোনার বাংলা" পরিণত হয় দরিদ্র ও রোগাক্রান্ত এক জনপদে।

৩. বি-নগরায়ন: ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের মতো একসময়ের সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক শহরগুলো জনশূন্য হয়ে পড়ে, কারণ সেখানকার মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি (শিল্প ও বাণিজ্য) ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ছিল মূলত একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা যা ভারতের স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিকে ধ্বংস করে তাকে বিশ্ব পুঁজিবাদের একটি প্রান্তিক অংশে পরিণত করেছিল। যদিও ব্রিটিশরা দাবি করে যে তারা রেলওয়ে বা আধুনিক শিক্ষা দিয়ে ভারতের উন্নয়ন করেছে, বাস্তবে তা ছিল শোষণের পথ প্রশস্ত করার আনুষঙ্গিক উপকরণ মাত্র। এই দুইশত বছরের শোষণের ক্ষত আজও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো কোনো অংশে দৃশ্যমান।

নেহরুভিয়ান মডেল (Nehruvian Model)

: কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও মিশ্র অর্থনীতির একটি ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ:-

১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে, তখন দেশটি ছিল একটি ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষতবিক্ষত ভূমি। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতের চিরাচরিত শিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং কৃষি ব্যবস্থা ছিল সেকেলে ও সামন্ততান্ত্রিক। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ এবং অশিক্ষায় জর্জরিত একটি দেশকে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিল জওহরলাল নেহরুর ওপর। এই প্রেক্ষাপটে নেহরু যে অর্থনৈতিক পথটি বেছে নিয়েছিলেন, তাকেই আমরা 'নেহরুভিয়ান মডেল' বলে জানি। এই মডেলটি ছিল মূলত 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' (Democratic Socialism)-এর ভারতীয় সংস্করণ।

১. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা: উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি

নেহরুভিয়ান মডেলের হৃদপিণ্ড ছিল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা (Centralized Planning)। নেহরু বিশ্বাস করতেন যে ভারতের মতো সীমিত সম্পদের দেশে বাজারের খেয়ালের ওপর অর্থনীতিকে ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে।

ক) পরিকল্পনা কমিশনের গঠন (১৯৫০)

১৯৫০ সালে ভারত সরকার পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। এটি ছিল একটি অ-সাংবিধানিক এবং উপদেষ্টা সংস্থা, যার প্রধান ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এই কমিশনের কাজ ছিল দেশের প্রাকৃতিক, মূলধনী এবং মানব সম্পদের মূল্যায়ন করা এবং সেগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বণ্টন করা।

খ) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five-Year Plans)

সোভিয়েত ইউনিয়নের 'গোসপ্ল্যান' (Gosplan) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬): এর মূল লক্ষ্য ছিল কৃষি উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১): এটি ছিল নেহরুভিয়ান মডেলের আসল ভিত্তি। একে 'মহালানবীশ পরিকল্পনা' বলা হয়। এখানে নজর দেওয়া হয় দ্রুত শিল্পায়ন এবং ভারী শিল্পের ওপর।

২. মিশ্র অর্থনীতি: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়

নেহরু সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পনা পছন্দ করলেও তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিসর্জন দিতে চাননি। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy)।

ক) সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান

এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা উভয়েই অর্থনীতির চাকা ঘুরাতে সাহায্য করে। তবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৫৬ সালের শিল্প নীতি প্রস্তাবে (IPR 1956) শিল্পকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

তফসিল 'ক': ১৭টি শিল্প ছিল পুরোপুরি রাষ্ট্রের অধীনে (যেমন- প্রতিরক্ষা, পরমাণু শক্তি, রেল)।

তফসিল 'খ': ১২টি শিল্প যেখানে রাষ্ট্র প্রধান ভূমিকা পালন করবে কিন্তু বেসরকারি খাতও বিনিয়োগ করতে পারবে।

তফসিল 'গ': বাকি সব শিল্প বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

খ) কমান্ডিং হাইটস (Commanding Heights)

নেহরু চাইতেন অর্থনীতি যাতে মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির হাতে চলে না যায়। তাই বিদ্যুৎ, খনি, ইস্পাত এবং ভারী যন্ত্রপাতির মতো খাতের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে রাখা হয়েছিল, যাতে সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

৩. ভারী শিল্পায়ন ও আধুনিক পরিকাঠামো

নেহরু জানতেন যে একটি দেশ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নয়, যতক্ষণ না সে নিজের কলকব্জা নিজে তৈরি করতে পারছে।

ক) "আধুনিক ভারতের মন্দির"

নেহরু বড় বড় বাঁধ, ইস্পাত কারখানা এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পকে "আধুনিক ভারতের মন্দির" বলে অভিহিত করতেন। ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC) এবং ভিলাই, রৌরকেল্লা ও দুর্গাপুরের ইস্পাত প্রকল্পগুলো ছিল এই মডেলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

খ) আমদানি বিকল্পায়ন (Import Substitution)

ভারতের শিল্পকে রক্ষা করার জন্য বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি কমিয়ে দেশে উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হয়। এর ফলে উচ্চ শুল্ক ও কোটা প্রথা চালু হয়। লক্ষ্য ছিল ভারতকে বাণিজ্যিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা।

৪. শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কারিগরি উন্নয়ন

নেহরুভিয়ান মডেল শুধু অর্থনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি ছিল একটি সামগ্রিক আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা। নেহরু বিশ্বাস করতেন যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (Scientific Temper) ছাড়া সমাজ এগোবে না।

IIT ও IIM প্রতিষ্ঠা: বিশ্বমানের প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপক তৈরির জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা হয়।

পারমাণবিক ও মহাকাশ গবেষণা: ডঃ হোমি ভাবার নেতৃত্বে পরমাণু শক্তি কমিশন এবং পরে মহাকাশ গবেষণার (ISRO) ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এই সময়েই।

CSIR: বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দেশজুড়ে ল্যাবরেটরির নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়।

৫. নেহরুভিয়ান মডেলের সাফল্য ও অর্জন

এই মডেলটি সমালোচিত হলেও এর কিছু ঐতিহাসিক সাফল্য রয়েছে:

শিল্প ভিত্তি: ভারত একটি শক্তপোক্ত শিল্প কাঠামো লাভ করে। আজ ভারত যে বিমান, মহাকাশ যান বা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে পারে, তার শুরুটা হয়েছিল নেহরু যুগেই।

খাদ্য নিরাপত্তা: প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিতে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে এবং পরে জলসেচ প্রকল্পের প্রসারের ফলে ভারত খাদ্যে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যায়।

আঞ্চলিক ভারসাম্য: অনুন্নত অঞ্চলে সরকারি কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর চেষ্টা করা হয়।

গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা: অনেক উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পনা ও গণতন্ত্র একসাথে চলতে পারেনি, কিন্তু ভারত তা সফলভাবে করে দেখিয়েছিল।

সমালোচনা ও ব্যর্থতা:

১৯৬০-এর দশকের শেষ দিক থেকে এই মডেলের কিছু নেতিবাচক দিক স্পষ্ট হতে শুরু করে:

ক) লাইসেন্স-পারমিট রাজ

অতিরিক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে একটি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তৈরি হয়। একটি ছোট কারখানা খোলার জন্য বা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকারের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হতো। এর ফলে দুর্নীতির জন্ম হয় এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সৃজনশীলতা নষ্ট হয়।

খ) অদক্ষ সরকারি ক্ষেত্র (PSUs)

অধিকাংশ সরকারি সংস্থা অলাভজনক হয়ে পড়ে। প্রতিযোগিতার অভাব থাকায় পণ্যের গুণমান হ্রাস পায় এবং সম্পদের অপচয় ঘটে।

গ) হিন্দু বৃদ্ধির হার (Hindu Rate of Growth)

অর্থনীতিবিদ রাজ কৃষ্ণ এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার বছরে গড়ে মাত্র ৩.৫% ছিল, যা জনসংখ্যা বিস্ফোরণের তুলনায় ছিল অত্যন্ত কম।

১৯৯১ সালে ভারত যখন গভীর অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে, তখন মনমোহন সিং ও পি.ভি. নরসিমা রাও উদারীকরণ (LPG Reform) শুরু করেন। এর ফলে নেহরুভিয়ান মডেলের অনেক কঠোরতা বিসর্জন দেওয়া হয়।

বর্তমানে আমরা যে মুক্ত বাজারের কথা বলি, তার সফলতার পেছনে নেহরু যুগের তৈরি করা উচ্চশিক্ষিত মানবসম্পদ (IIT/IIM graduates) এবং পরিকাঠামোর বড় অবদান রয়েছে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া সেই সময়ে ভারতের মতো দেশের প্রাথমিক শিল্পায়ন সম্ভব ছিল না।নেহরুভিয়ান মডেল ছিল একটি মহৎ স্বপ্ন। এটি ছিল আধুনিকতা, বিজ্ঞান এবং সাম্যের এক মেলবন্ধন। যদিও পরবর্তীকালে এর সীমাবদ্ধতাগুলো প্রকট হয়েছিল এবং ১৯৯১-এর সংস্কারের প্রয়োজন পড়েছিল, তবুও এই মডেলটিই ভারতকে একটি বিশৃঙ্খল উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতি হওয়ার পথে প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করেছে। নেহরুর সেই "আধুনিক ভারতের মন্দির" গুলো আজও ভারতের উন্নয়নের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।দাঁড়িয়ে

ভারতে মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy in India)

মিশ্র অর্থনীতি হল এমন এক অর্থব্যবস্থা যেখানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি চলে। সামাজিক ও আর্থিক সাম্যের প্রয়োজনে, সমাজকল্যাণের সার্বিক লক্ষ্যকে কার্যকর করার প্রয়োজনে সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা এবং একই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাজারের ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিযোগিতার গতিকে সচল রাখার প্রয়োজনে অনেক দেশই মধ্যপন্থা হিসাবে মিশ্র অর্থনীতিকে স্বাগত জানায়। মিশ্র অর্থনীতি এক অর্থে সমাজতন্ত্র ও স্বাতন্ত্র্যবাদী (উদারবাদী) ব্যবস্থার এক মাঝামাঝি পথ। তবে মিশ্র অর্থনীতি কতটা মিশ্র অর্থাৎ এখানে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের ভাগ কতটা তার গাণিতিক পরিমাপ সম্ভব নয়। সাধারণত উৎপাদন, বিনিয়োগ, সম্পদ-সংগ্রহ ইত্যাদির বিচারেই এই ধরনের অর্থনীতির অবস্থান বিচার করা হয়। সাধারণভাবে আর্থিক উন্নয়নে এবং বিশেষভাবে শিল্পোন্নয়নে সরকারের ভূমিকা কী হবে এটাই একটা দেশের মিশ্র অর্থনীতির গোড়ার কথা।

ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণা গ্রহণ করা হলেও এদেশে অর্থনীতির রূপরেখাটি তেমন স্পষ্ট নয়। পরিকল্পিত অর্থনীতি উৎপাদন, মালিকানা ও ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে অবাধ গতিবিধিকে স্বীকার করে না, রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে চায়। ভারতবর্ষে সরকারি..

নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার পরিধি স্পষ্ট নয়। সম্ভবত পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়নের গোড়া থেকেই পরিকল্পনার সঙ্গে এই অস্পষ্টতা। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ধাঁচকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেও, সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার পক্ষে তীব্র অনুরাগ থাকলেও, ভারতের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাথে (বিশেষত আমেরিকার সাথে) সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিপক্ষে এবং ভারত বাণিজ্যিক পথেই ছিল। পরিকল্পিত অর্থনীতির নীতিকে একরকম আপসনামারুপেই সেই পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এর কঠোর প্রয়োগ বা এটিকে দমন বা নিশ্চিহ্নতার পথে নেওয়া করার কথা ভাবা হয়নি। স্বাধীনতার অব্যবহিত বেশ কিছু শিল্পে এদেশের শিল্পপতিরাই তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। উৎপাদন কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয় না, সরকারের পক্ষে অনেক উদ্যোগের দায় বা দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয় না। এমনকি কতগুলি ক্ষেত্রে (কয়লা, তেল, বিদ্যুৎ যোগাযোগ, রাসায়নিক সার ইত্যাদি) সরকারের দায়িত্ব নেওয়া সামাজিক, জাতীয় স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি সরকারের হাতে রেখে, অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চলবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতারই এরা উদ্যোগী হবে—একদম একটি নীতিকে সামনে রেখেই শুরু হয় এদেশের আর্থিক বিকাশ ও শিল্পোন্নয়নের ধারা। শিল্পোন্নয়নের এই ধারার নামই হল মিশ্র অর্থনীতি।

ভারতের মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, উভয়েরই উদ্যোগ ও উৎসাহ গুরুত্ব পেয়েছে। ব্যক্তিগত সংস্থা ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সংস্থা উভয়েই ভারতের অর্থনীতির সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে আশা রাখা হয়। বলা হয়, মিশ্র অর্থনীতি সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংস্থার গুরুত্বের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করেছে, সরকারি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিক উৎসাহ দেখাবে। বেসরকারি সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা নীতির দ্বারা প্রভাবিত হবে, এ আশা পোষণ করা হয়। বেসরকারি সংস্থাসমূহও জনস্বার্থের নীতি দ্বারা পরিচালিত হবে এবং সরকারি সংস্থাসমূহের দ্রুত বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটবে, এই উভয় লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে রক্ষা করা হয় এদেশের মিশ্র অর্থনীতি (“In a Mixed Economy there is no room for completely unregulated private enterprise; even private enterprise must have a public purpose. At the same time the public sector has to expand rapidly.”)।

● মিশ্র অর্থনীতির প্রয়োগ (Application of Mixed Economy)

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতি : স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভিন্ন শিল্পনীতির ঘোষণায় মিশ্র অর্থনীতির আদর্শকে ভারত সরকার স্বাগত জানিয়েছে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সরকারের মূল শিল্পনীতিতে (Industrial Policy of the National Government, 1948) মিশ্র অর্থনীতির আদর্শকে প্রথম গ্রহণ করা হয়। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি এবং এর সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা ছিল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতির উদ্দেশ্য। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের যৌথ দায়িত্বে শিল্পের উন্নয়ন ও শিল্প-ব্যবস্থার

পরিচালনার নীতিও এই শিল্পনীতিতে ঘোষিত হয়। অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন, পারমাণবিক শক্তির গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ এবং রেলপথের মালিকানা ও পরিচালনা রাষ্ট্রের একচেটিয়া এলাকাধীন বলে শ্রেণিভুক্ত হয়। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, যেমন—কয়লাখনি, লৌহ-ইস্পাত, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতিকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রাংশ বলে ঘোষণা করা হয়। এই শিল্পগুলিকে ১০ বছরের জন্য—অর্থাৎ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেসরকারি মালিকানাধীন বা তত্ত্বাবধানে রাখা চলতে পারে একথাও বলা হয়। চিনি, তুলা, সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে বেসরকারি উদ্যোগের অস্তিত্ব থাকলেও এগুলি সম্পর্কে সরকারি নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োজনে কার্যকর হবে বলা হয়। শিল্পক্ষেত্রের অন্যান্য অংশে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণসহ বেসরকারি উদ্যোগকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের শিল্প আইন : ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে সরকারকে শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়। পুরনো বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলির পুনর্নবীকরণ এবং নতুন শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে লাইসেন্সের নীতিকে কার্যকর করার কথা ঘোষিত হয়। বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলির স্থান নির্বাচন, উৎপাদন ও বিনিয়োগের কাম্য নীতি ধার্য করাই ছিল এই আইনের লক্ষ্য। উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আর্থিক কেন্দ্রীভবন রোধ করা এবং আঞ্চলিক ভারসাম্য বিধান করার নীতি এই আইনে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের শিল্প-আইন প্রথম পরিকল্পনাকালে সরকারের শিল্পনীতির লক্ষ্যকে পরোক্ষে প্রতিফলিত করে।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতি : ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির লক্ষ্যকে প্রয়োগ করার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়। মিশ্র অর্থনীতির ধারণাকে বাস্তবায়িত করা এবং শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উত্তরোত্তর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার নীতিও এই শিল্পনীতিতে ঘোষিত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতি সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার কার্যক্রমকে প্রকাশ করে। উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর মালিকানার কেন্দ্রীভবন রোধ করা এবং শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতিকে রূপ দেওয়ার মধ্যেই ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতির সার্থকতা। শিল্পক্ষেত্রের একটি পরিমার্জিত শ্রেণিবিভাগ করে বলা হয় : (১) অস্ত্রশস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, খনিজ তেল, বিমানপোত, জাহাজ, রেলপথ এবং ১৭টি শিল্পে উন্নয়নের অনন্য দায়িত্ব সরকারের। (২) খনিজ শিল্প, রসায়ন, রাসায়নিক সার, মোটর ও জাহাজ চলাচল প্রভৃতি ১২টি শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকবে এবং ক্রমশ এগুলি সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। (৩) অবশিষ্ট শিল্পে বেসরকারি উদ্যোগ থাকবে এবং সরকার এগুলিকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান করবে।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতার নীতিকে প্রচার করা হয়। আঞ্চলিক বণ্টন-ব্যবস্থার বৈষম্য দূর করা, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহিত করার নীতিও ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতিতে প্রতিফলিত।

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনাকালে (৬০-এর দশকে) মিশ্র অর্থনীতির লক্ষ্য থেকে সরকারের সাময়িক বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। এই সময় আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন প্রতিরোধের জন্য এবং উত্তরোত্তর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির জন্য সরকারি তরফে বেশ কিছু প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে একচেটিয়া কারবার অনুসন্ধান কমিশন এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে শিল্প-লাইসেন্স নীতি অনুসন্ধান কমিটি গঠন, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে একচেটিয়া কারবার ও অন্তরায়মূলক ব্যবসায় আইন (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969) পাস, ১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংক জাতীয়করণের প্রস্তাব এবং এর কিছুকাল পরেই রাজন্য ভাতা বিলোপের আইন পাস করার মধ্যে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ এবং সরকারি হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের শিল্প-লাইসেন্স নীতিতে অবশ্য আবার ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতির আদর্শে আস্থা পোষণ করা হয়। সরকারি দায়িত্বের সম্প্রসারণের নীতিকে সমর্থন জানানো হলেও ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের শিল্প-লাইসেন্স নীতিতে যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্র (Joint Sector) প্রাধান্য দেওয়া, মূল শিল্পের (Core industries) সম্প্রসারণে বৃহৎ শিল্প সংস্থাসমূহকে ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে বেসরকারি ক্ষেত্রকে সম-সুযোগ ও সুবিধা দানের নীতি গৃহীত হয়।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জনতা সরকার যে আর্থিক নীতি ও শিল্পনীতি ঘোষণা করে তাতেও মিশ্র অর্থনীতির মূল ধারাটি

অব্যাহত ছিল। সরকারি উদ্যোগের সম্প্রসারণ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহদান এবং বিদেশি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণের কথা সরকারি নীতিতে ঘোষিত হয়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতিতে শিল্পায়নের সুষম বণ্টন, গতিশীল অর্থব্যবস্থ

গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ প্রভৃতি লক্ষ্য ঘোষিত হয়। এই শিল্পনীতিতে সরকারি উদ্যোগের সম্প্রসারণ এবং সামাজিক স্বার্থের সংগে সংগতি রেখে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়। বিনিয়োগের সম্প্রসারণ, উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনীতির প্রসার, আঞ্চলিক বৈষম্য রোধ প্রভৃতির ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ সহযোগিতার সাথে অগ্রসর হবে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

আর্থিক সঙ্কটের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভারতের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনীতির ধারণা জোরালোভাবে কার্যকর হতে পারেনি সরকারের শিল্পনীতির উদারতা ও নমনীয়তার জন্য। এই সময় থেকেই একদিকে দেখা গেছে সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিমুখতা এবং পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিথিলতা। এম. আর. টি. পি. আইন শিথিল করে কোম্পানিগুলির সম্পদের সীমা ২০ কোটি থেকে বাড়িয়ে করা হল ১০০ কোটি। এই আইনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ২৫টি শিল্পকে লাইসেন্স নেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে বেশ কিছু শিল্প ও ওষুধ কারখানা লাইসেন্স থেকে অব্যাহতি পেল। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ২৪ জুলাই ভারত সরকার যে শিল্পনীতি ঘোষণা করেন তা নেহরু প্রবর্তিত শিল্পনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়। লাইসেন্স প্রথা প্রায় আর তেমন কিছু থাকল না, বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সীমা বেড়ে গেল, আটটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সমস্ত রাষ্ট্রীয় শিল্পকে শেয়ার বাজারে ছাড়া শুরু হল। আন্তর্জাতিক শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য Foreign Investment Board স্থাপিত হল। মোদ্দা কথায় নতুন শিল্পনীতি হল নিয়ন্ত্রণহীন, প্রতিযোগিতামূলক, উদারধর্মী, বাজার অর্থনীতির অনুসারী। অষ্টম পরিকল্পনাকারীরা এই শিল্প নীতির লক্ষ্যে বললেন, 'operation economic reform', 'a strong, viable economy compatible with global economic environment'। অষ্টম পরিকল্পনাকে সাজানো হয় এই নতুন শিল্প আবহের সংগে সংগতি রেখে। বলা হয়, এই পরিকল্পনা হল নতুন যুগের মিশ্রিত এক নতুন আবাহন, নতুন নতুন ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের দায়িত্ব বিপক্ষকে এক নতুন কার্যক্রম। ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিরা কোন্ ক্ষেত্রগুলোতে পূরণ করবে বর্তমানে পরিকল্পনা সে পথ বলে না, বর্তমানে পরিকল্পনা দেখিয়ে দেয় শিল্পপতির কাজে কোন্ কোন্টায়, কী দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হবে। Quantitative Target নয়, Quantitative Improvement-এর দিকে তাকিয়ে, কোন্ কোন্ শিল্পে বেসরকারি ক্ষেত্র কী সুবিধা পাবে, কিভাবে তাদের সুযোগ সুবিধাগুলো তাদের এগোতে হবে, কিভাবে দেশের সম্পদ বাড়াতে হবে অষ্টম পরিকল্পনা সেইদিকেই দিকনির্দেশনা এবং নির্দে

ভারতের মিশ্র অর্থনীতিতে পরিকল্পনার পক্ষে যে যে যুক্তি দেওয়া হয় সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

১. দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থেই, একটি সুসামঞ্জস্য অর্থনীতি গড়ে তোলার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যেই পরিকল্পনা একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা।

২. পরিকল্পনার মাধ্যমেই বেসরকারি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব, অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করতে পরিকল্পনা এক সার্থক ব্যবস্থা।

৩. সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনে, সামগ্রিক অর্থনৈতিক বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের লক্ষ্যকে অর্জন করার প্রয়োজনেও পরিকল্পনা আবশ্যিক।

৪. ভারতের মতো অর্থনীতিতে রাষ্ট্র যাতে সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এবং প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেও পরিকল্পনার তাৎপর্য রয়েছে। রাষ্

নির্দেশিত পথেই এবং তদারকিতেই যাতে অর্থনীতি পরিচালিত হয়, বেসরকারি উদ্যোগ যাতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতেই পরিচালিত হয় সেই লক্ষ্যটিও পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

মিশ্র অর্থনীতিতে পরিকল্পনার ধারণাটি মূল্যহীন এই মতে যাঁরা আস্থা প্রকাশ করেন তাঁদের যুক্তিগুলিকেও অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, নিয়ন্ত্রণই হল পরিকল্পনার প্রধান কথা। সমাজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে, বিশেষ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ও মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করাই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। ভারতের মতো দেশে, যেখানে বৃহৎ শিল্পপতি, মূলধন মালিক, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী দেশের মোট সম্পদের প্রধান অংশেরই মালিক, সেদেশে এইসব শিল্পপতি ও মূলধন মালিকের স্বার্থ ও কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক স্বার্থের সংরক্ষণ সম্ভব এরকম চিন্তা করাও অমূলক। অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর কেন্দ্রীভবন যত বাড়বে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তথা সামাজিক উদ্যোগের ক্ষেত্র তত সংকুচিত হবে। এই পরিস্থিতিতে পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ সম্ভব কি?

দ্বিতীয়ত, এদেশের পরিকল্পনার গতিটি লক্ষ্য করলেও এই আশঙ্কা সত্য বলে মনে হয় যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এখানে রোধ করা সম্ভব হয়নি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণের যে নীতি বিভিন্ন পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছে তা কোনোভাবেই অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করতে সমর্থ হয়নি। একচেটিয়া কারবার অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্টে (১৯৬৫) বলা হয়েছে, ভারতে টাটা ও বিড়লা গোষ্ঠী ব্যাংকিং ছাড়া অন্যান্য কারবারের সম্পত্তির শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগের মালিক। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের একটি হিসাব অনুযায়ী ১০টি বৃহৎ একচেটিয়া গোষ্ঠীর (টাটা, বিড়লা, মোদী, মফতলাল, জে. কে. থাপার, আই. সি. আই., সারাভাই, এ. সি. সি., বাঙ্গুর ও শ্রীরাম) সম্পত্তির পরিমাণ এক বছরে ৪,৭৮৩.৮৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬,০১৩.২৫ কোটি টাকা। একচেটিয়া কারবার সংক্রান্ত অনুসন্ধান কমিশন লক্ষ করেছে চা, চিনি, শিশু খাদ্যদ্রব্য, মোটর গাড়ি, দেশলাই, টায়ার, রেফ্রিজারেটর এরকম ১০০টা দ্রব্যের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের অস্তিত্ব আছে এবং এর মধ্যে ৬৫টি দ্রব্যের ক্ষেত্রে মাত্র তিনটি গোষ্ঠীর প্রাধান্য। একচেটিয়া কারবার ও অন্তরায়মূলক আইন বলবৎ হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা সম্ভব হয়নি। বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি একরকম অবাধেই তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে চলেছে।

সপ্তম ও অষ্টম পরিকল্পনাকালে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকার উদারনীতির যে ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তা সরকারি দৃষ্টিতে বৈপ্লবিক মনে হলেও কার্যত মিশ্র অর্থনীতির আদর্শ থেকেই বিচ্যুতি বলে সমালোচকরা মনে করেন। এর ফলে সরকারি শিল্পোদ্যোগের পরিসর ক্ষুদ্র হয়েছে, বেসরকারি উদ্যোগের মুনাফা প্রবণতার চাপে সরকারি উদ্যোগের উৎপাদন ও বণ্টনের নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। শিল্প লাইসেন্সের বিলোপ অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় ও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে এ ধারণা ভারতের মতো দেশে কতটা কার্যকরী তা সন্দেহজনক। মুক্ত অর্থনীতির জোয়ারে, বাজার অর্থনীতি ও ভোগ অর্থনীতির কৌশলের কাছে নতি স্বীকার করেছে মিশ্র অর্থনীতির সামাজিক ও মানবিক স্বার্থ।

তৃতীয়ত, মিশ্র অর্থনীতিতে পরিকল্পনার সাফল্য নির্ধারিত হয় প্রধানত দুটি দিক থেকে : ১. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র কতটা গুরুত্ব পেয়েছে অর্থাৎ বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে আমাদের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ২. আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কতটা সফল? সপ্তম পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পিত অর্থনীতি ততটা সফলভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দের একটি সরকারি পরিসংখ্যানের হিসাব তুলে ধরলে দেখা যাবে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, মূলধন গঠন বা ভোগ-ব্যয় সবক্ষেত্রেই সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রের গতি...

বেসরকারি উদ্যোগের তুলনায় অনেক শিথিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে রপ্তানির ক্ষেত্রে, বিক্রয় বা নীট মুনাফার ক্ষেত্রে, সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের সাফল্য পূর্বের বছরগুলির তুলনায় অনেক কৃতিত্বপূর্ণ। কিন্তু বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এই কৃতিত্বকে বিচার করলে সমস্ত ব্যাপারটাই হতাশাজনক মনে হতে পারে। সরকারি প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রিতা, নির্মাণ কাজের ব্যয়াধিক্য, ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ননীতি এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব কোনো কিছুই এদেশে পরিকল্পনার সাফল্যকে তুলে ধরে না বরং প্রকাশ করে সামগ্রিক ব্যর্থতাকে। সরকারি উদ্যোগের ব্যর্থতার একটি বড় কারণ হল পূর্বেকার শিল্পনীতি থেকে সরকারের

অপসারণ। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শিল্পনীতির, নেহরুর সরকারি উদ্যোগ সম্প্রসারণের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী বলে সমালোচকরা মনে করেন। নতুন শিল্পনীতি নিয়ন্ত্রণের বদলে এনেছে বিনিয়ন্ত্রণ (De-regulation)। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের পরিধিকে মাত্র ৮টি ক্ষেত্রে সংকুচিত করে শিল্পনীতি সরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করার বদলে একে নিরুৎসাহ করেছে, সরকারি ক্ষেত্রের বিদায়ের পথ প্রশস্ত করেছে।

চতুর্থত, ভারতের মতো দেশে পরিকল্পনার সাফল্য বিচার করার একটি মানদণ্ড হল পরিকল্পনার মাধ্যমে আঞ্চলিক ভারসাম্য এদেশে কীভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে তা দেখা। কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের বর্তমান গতিটি লক্ষ্য করে বলা যায়, আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্য বা কৌশল মোটেই সন্তোষজনক নয়। রাজ্যের উন্নয়ন বা অগ্রগতির স্বার্থে বা আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে পরিকল্পনাকে সঠিক ও সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে যতটা সম্পদ সমাবেশ করা দরকার, যতটা অর্থ বণ্টন করা দরকার সেই পরিমাণ অর্থ রাজ্যগুলি সবক্ষেত্রে পায় না। আঞ্চলিক বৈষম্যরোধে পরিকল্পনা একরকম ব্যর্থ বলে অনেকে অভিযোগ করেন।

পঞ্চমত, ভারতের মতো মিশ্র অর্থনীতিতে পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণা গ্রহণ করা হলেও, এই পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের স্বার্থে যা কিছু করা দরকার তেমন কিছু করা হয়নি বলেও অনেকে অভিযোগ করেন। পরিকল্পনাকে যদি ‘co-ordinated programme of action’ বলে বর্ণনা করা হয় তবে বিচার করে দেখা দরকার, পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই coordination অর্থাৎ সমন্বয় আছে কি না? পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে যাঁরা যুক্ত, দেশের বা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের কথা মনে রেখে তাঁরা কাজ করেন কি না এটা লক্ষ্য রাখতে হবে, এক্ষেত্রে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের উভয়েরই ভূমিকা আছে। অবশ্যই কতগুলি প্রশাসনিক নিয়ম বা নির্দেশকে সামনে রেখে অগ্রসর হলে চলবে না, স্থানীয় চাহিদা, প্রবণতা প্রভৃতিকেও বিচার করতে হবে। স্থানীয় উদ্যোগ ও উৎসাহকেও পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে ব্যবহার করতে হবে। দায়িত্বের সঙ্গে, সাফল্যের সঙ্গে পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পক্ষপাতমূলক দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হলে চলবে না, চাই এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। উন্নয়নের প্রশ্নে, অগ্রাধিকারের প্রশ্নে এই দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে আমাদের দেশে পরিকল্পনা কখনই সফল হবে না। পরিকল্পনা দেশের সকলের স্বার্থেই, কতিপয়ের স্বার্থে নয়—জনগণের কাছে পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্যতা এই অর্থেই (“When there is a widespread feeling that the plan is for the benefit of the few, while it calls for sacrifices from the many, implementation must face truely insuperable hurdles.”)। সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪-তম সংশোধনের মাধ্যমে গ্রামীণ ও পৌর স্বায়ত্তশাসন ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হয়েছে, স্থানীয় পরিকল্পনা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে এ দাবি করা হলেও, রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে কতটা উদ্যোগী হবে, কতটা সাফল্যের সঙ্গে স্থানীয় পরিকল্পনাকে প্রয়োগ করেছে তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ থেকেই যায়। পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক বা অন্য কিছু রাজ্য অবশ্য এক্ষেত্রে কিছুটা আশার সঞ্চার করেছে।

সবুজ বিপ্লব (Green Revolution)

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই সবুজ বিপ্লবের ধারণাটি তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মতো ভারতেও গুরুত্ব লাভ করে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির নিবিড় পন্থা সাময়িকভাবে বর্জিত হলেও একেই আরো নতুন করে নতুন পন্থায় ব্যবহার করার এক উদ্যোগ লক্ষ করা গেল। মেক্সিকোতে রকফেলার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গম উৎপাদনে যে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে বা মেক্সিকোর গম ও জাপানের ক্ষুদ্র বীজের সমন্বয়ে যে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন শস্য উৎপাদন হয়েছে, ফিলিপাইনে ধান উৎপাদনে যে উন্নতি ঘটেছে, তাইওয়ানে কৃষিতে যে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে তার পেছনে যে একটি নিবিড় চাষ বা উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাব ছিল এবং ভারতবর্ষেও যে কৃষিতে এই ধরনের উন্নতি সম্ভব একথা ভেবেই ষাটের দশকের শেষাশেষি ভারতেও কৃষি উৎপাদনের এক নতুন কৌশল গ্রহণ করা হল। কৃষিতে অধিক উৎপাদনের নীতিকে অর্জন করার উদ্দেশ্যে কৃষির প্রযুক্তিগত উন্নতি ও কৃষির আধুনিকীকরণের যে পন্থা বা পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা বলা হল, সেটিই সবুজ বিপ্লব নামে পরিচিত হল। সবুজ বিপ্লব কথাটির একটি

সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধ্যাপক অশোক রুদ্র। অধ্যাপক রুদ্র বলেছেন :

“বিপ্লব বলতে সচরাচর বোঝানো হয়ে থাকে কোনো কিছুর মধ্যে আমূল প্রগতিমুখী পরিবর্তন। ষাটের দশকে এইপ্রকার একটি বিশাল ঐতিহাসিক পরিবর্তন কোনো কোনো দেশের কৃষিতে ঘটে গিয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এবং তাঁরা ‘সবুজ বিপ্লব’ কথাটা ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। সবুজ বিশেষণটির মধ্যে একটি ইঙ্গিত আছে। সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে লাল রঙটির একটি ঐতিহ্যগত অনুষঙ্গ আছে। সবুজ বিপ্লবের কথা যাঁরা বলেন তাঁরা বোঝাতে চান যে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হলে তার জন্য সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপ্লবের কোনো প্রয়োজন নেই।”১৯

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই কৃষি উৎপাদনে অচলাবস্থা, নৈরাশ্যজনক খাদ্যসমস্যা, খাদ্যশস্যের জন্য বিদেশের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা আর প্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কথা ভেবে কৃষিমন্ত্রক যে নতুন কৃষি উন্নয়ন কৌশল, নতুন কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কথা কল্পনা করেছে, কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা সম্পূর্ণ নতুন গতি আনতে চেয়েছে, সেটাই সবুজ বিপ্লব নামে পরিচিত। সবুজ বিপ্লব নিবিড় পন্থায় চাষ ও উৎপাদনের কথা বলে অর্থাৎ বলতে চায় উৎপাদনের জন্য পুঁজি, কাঁচামাল, সেচ এসব প্রয়োগ করতে হবে নিবিড়ভাবে। জল, সার, বীজ সবকিছুকেই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হবে। কৃষি মন্ত্রকের দৃষ্টিতে এটি হল, ‘Planning for the special intensive programmes around the high-yielding varieties.’ কৃষি মন্ত্রকের প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত তাঁরা আত্মনির্ভরশীলতার এক সূত্র এক সমাধান খুঁজে পেয়েছেন : উচ্চ ফলনশীল বীজের মাধ্যমেই শস্য উৎপাদন হবে। সুতরাং আরও রাসায়নিক সার, প্রয়োজনমতো জল, জলসেচন ও নিষ্কাশন চাই আর চাই কীটনাশক ওষুধ যা বীজের প্রতিরোধশক্তি বাড়াবে। এই বীজে কম সময়ে ফসল ফলবে, আর এর ফলে জমিতে এক বছরে একাধিক ফলনের সুযোগও থাকবে। নতুন প্রযুক্তি অর্থাৎ সবুজ বিপ্লব আগেকার ব্যর্থ অভিজ্ঞতাকে কাটিয়ে কৃষি উৎপাদনে আনবে এক বড়োসড়ো পরিবর্তন এই আশা নিয়ে কৃষিমন্ত্রক আগেকার দৃষ্টিভঙ্গিকে ত্যাগ করে কৃষিপণ্যের মূল্য ধার্য করলেন কৃষকের অনুকূলে।

ভারতবর্ষের দীর্ঘকালের স্থবির কৃষি অর্থনীতিতে সবুজ বিপ্লব যে একটি চাঞ্চল্য বা আলোড়ন তুলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের সর্বত্র না হলেও কিছু কিছু অঞ্চলে, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষিতে উৎপাদনের হার যে হারে বেড়ে গেছে, বিশেষ করে গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে তার দিকে লক্ষ দিলে অবশ্যই একে বিপ্লব বলা যেতে পারে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় যেখানে ১৯৬৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছিল বাৎসরিক ২.৮ শতাংশ হারে, ওই হার এক লাফে ১০ শতাংশ বেড়ে যায় ১৯৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে এবং তার পরবর্তীকালে। ভারতবর্ষের কিছু কিছু রাজ্যে সবুজ বিপ্লবের যে ধারা সূচিত হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করলে দুটি বিষয় আবিষ্কার করা যাবে : ১. সরকারি নীতির ক্ষেত্রে এক নতুন পন্থা ও পদ্ধতিকে গ্রহণ করার প্রবণতা এবং ২. এদেশে কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন নতুন গবেষণার উদ্যোগ। মেক্সিকো, ফিলিপাইন বা তাইওয়ানে উচ্চ ফলনশীল গম বা ধানের বীজের উদ্ভাবন কেমন করে সম্ভব হল, ভারতবর্ষেও সে রকম সম্ভব এই আশা নিয়ে এদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করলেন। Indian Council of Agricultural Research (ICAR), পাঞ্জাবের লুধিয়ানা বা উত্তরপ্রদেশের পন্থনগরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞানীদের গবেষণা উচ্চ ফলনশীল শস্যবীজ, বিশেষ করে খাদ্যশস্য ও জোয়ার-বাজরা, ভুট্টার বীজ উৎপাদনে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে।

সবুজ বিপ্লবের বিভিন্ন লক্ষণকে এইভাবে দেখানো যায় :

১. এই বিপ্লব উচ্চ ফলনশীল বীজের উদ্ভাবন এবং কৃষিতে তার ব্যাপক প্রয়োগের কথা বলে। উচ্চ ফলনশীলতা বলতে বোঝানো হয় যাদের ফলনশীলতা সাধারণ বীজের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। কৃষিবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যেসব বিস্ময়কর বীজ (wonder seeds) আবিষ্কার করলেন ফলনশীলতার বিচারে তারা বিশেষ গুণসম্পন্ন। এই বীজ বপন করলে উৎপাদনের হার যে বহুগুণে বেড়ে যাবে কৃষিবিজ্ঞানীদের তাতে কোনো সন্দেহই রইল না। উচ্চ

ফলনশীল এইসব বীজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : পি. ভি. ১৮, কল্যাণ সোনা ২২৭, সোনালিকা (এস. ৩০৮) ডব্লিউ. এল. ৭১১, মুক্তা, বাজরা এইচ. ডি. ১০, ধান আই. আর. ৮, পি. আর. ১০৬ প্রভৃতি। নিবিড় কৃষি জেলা প্রকল্পগুলিতে উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার কৃষি উৎপাদন প্রায় ৪০ ভাগ বাড়িয়েছে।

২. উচ্চ ফলনশীল বীজগুলির চাষে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধের চাহিদা বেড়ে গেছে। রাসায়নিক সার ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে এর প্রয়োজন পূর্বের তুলনায় প্রায় ১০ ভাগ বেড়েছে। ১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে যেখানে রাসায়নিক সারের প্রয়োজন ছিল ২.৯২ লক্ষ টন ১৯৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১.৭৭ লক্ষ টন। চাষিরা যাতে উচ্চ ফলনশীল বীজের চাষে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সরকার চাষিদের উদারভাবে ঋণ দেবার পরিকল্পনা নিয়েছে।

৩. সবুজ বিপ্লবের অবদান শুধু উচ্চ ফলনশীল বীজের উৎপাদন ও ব্যবহারে নয়, একই জমিতে বছরে দুবারের অধিক, তিনবার এমনকি চারবার ফসল ফলানোর সুযোগ বৃদ্ধি। একই বছরে শীতে, গ্রীষ্মে এবং বর্ষায় তিনবার ফসল ফলানোর সুযোগ, একই সঙ্গে একটি শস্যই নয়, বহু শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

৪. সবুজ বিপ্লব নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও আধুনিক ব্যবস্থাদির ব্যবহার সম্ভব করেছে। কৃষির আধুনিকীকরণের কাজে ব্যবহার হয়েছে ট্রাক্টর, নতুন পাম্পিং সেট, টিউবওয়েল প্রভৃতি। এর ফলে কৃষি উৎপাদন এবং সেচের কাজে একদিকে প্রচুর সময় অপচয় রোধ করা গেছে অন্যদিকে এই সময় অপচয় বন্ধের জন্য এই জমিতে বহুবার চাষের সুযোগ হয়েছে।

৫. সবুজ বিপ্লব সরকারি নীতির ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছে। কৃষি পণ্যের মূল্য সম্পর্কে সরকার উদার নীতি গ্রহণ করেছে। কৃষি পণ্যের মূল্যকে সরকার এমন অবস্থায় রাখার চেষ্টা করেছে যাতে তা একটা নিম্নতম হারের নিচে না নামে। বিশেষ অবস্থায় সরকার নিজেই উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতা হিসাবে উপস্থিত হয় এবং চাষি যাতে পণ্যের মূল্য সঠিকভাবে পায় সে ব্যাপারে সতর্ক নজর রাখে।

৬. শুধু রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ওষুধপত্র পেতে সাহায্য করাই নয়, চাষিরা যাতে আধুনিক চাষের উপযোগী যন্ত্র নিজেরাই কিনতে পারে সে ব্যাপারেও সরকারের নীতি উদার হয়েছে। ব্যাংক ও কৃষি ঋণদান সংস্থার মাধ্যমে কৃষক যাতে স্বল্প সুদে ঋণ পায় তার ব্যবস্থা সরকার করেছে।

৭. উৎপাদিত শস্যের পরিপাক ক্রিয়া (processing), সংরক্ষণ, বিক্রির বাজারের প্রসারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের জোগান, মূল্য ইত্যাদি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও সরকার করেছে।

● সবুজ বিপ্লবের তাৎপর্য (Significance of Green Revolution)

সবুজ বিপ্লবের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে সুফল পাওয়া গেছে অর্থনীতিবিদরা একথা অস্বীকার করেন না। উচ্চ ফলনশীল জাতীয় শস্যবীজ পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় ৭ গুণ বেড়েছে। ১৯৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই ধরনের শস্যবীজের উৎপাদন যেখানে ছিল ২০ লক্ষ হেক্টর ১৯৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫৫ লক্ষ হেক্টর। রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ ১০ বছরে বেড়েছে প্রায় ৮ গুণ। পাম্প সেট, শ্যালো টিউবওয়েল প্রভৃতির ব্যবহার বেড়েছে ৫ বছরে প্রায় ৫ গুণ। সেচের এলাকা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। বেড়েছে বহু ফলনশীল জমির পরিমাণ। ট্রাক্টর ব্যবহারের পরিমাণ ১৯৬- ৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেড়েছে প্রায় ১০ গুণ। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বেড়েছে এইসব উপাদানগুলির কেনাকাটার জন্য ঋণ গ্রহণের সুবিধা। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ১৪টি ব্যাংক জাতীয়করণের পর এই সুবিধা আরও বাড়ানো হয়েছে। ১৯৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতিগুলি ও ব্যাংকগুলি স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন ঋণ দিয়েছে যথাক্রমে ২,০৮৪ কোটি

টাকা এবং ৪৬১ কোটি টাকা।

প্রশ্ন উঠেছে সবুজ বিপ্লবের ফলাফল সত্যই কতটা বৈপ্লবিক? এ সম্পর্কে দুটি পরস্পরবিরোধী যুক্তি আছে। একদল মনে করেন, সবুজ বিপ্লব কোনোভাবেই কৃষির ক্ষেত্রে কোনো রূপান্তর সাধনে সমর্থ হয়নি। এঁরা বলেন, ভারতের মতো অর্ধোন্নত দেশে পুঁজিবাদী পথে কৃষির উন্নয়নের তাৎপর্য কী? প্রকৃত কৃষক অর্থাৎ জমিতে যারা শ্রম করে তারা এই বিপ্লব থেকে কী উপকার পেয়েছে? উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত যন্ত্রপাতি বা সারের ব্যবহার এইসব কৃষকদের কতটা শ্রীবৃদ্ধি করেছে? সমবায় ঋণদান সমিতি বা ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ঋণগ্রহণকারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই হল ধনী কৃষক এবং দরিদ্র কৃষকরা মহাজনদের কাছেই ঋণের দায়ে বন্ধ। ট্রাক্টর বা পাম্প সেট কেনার মতো অর্থ জোগাড় করবার ক্ষমতা এদের নেই। সম্পন্ন বা অবস্থাপন্ন চাষিরাই এইসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছে। সুতরাং সেচ-ব্যবস্থার যা কিছু সুবিধা ধনী কৃষকরাই ভোগ করছে। কৃষিপণ্যের সরকার নির্ধারিত মূল্যও সাধারণ চাষির পক্ষে যায় না। ক্রেতার স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারেও সরকারের প্রচেষ্টা প্রমাণ করে না দেশে সবুজ বিপ্লব ঘটেছে। কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদান, যেমন রাসায়নিক সার বা সেচের যন্ত্রপাতির দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে সেটাও এক ধরনের বিপজ্জনক প্রবণতা। মূলধন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির এই প্রবণতা খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি ঘটাবে বলে আশঙ্কা করা হয়। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, সবুজ বিপ্লব যদি ঘটেই থাকে তবে কৃষির সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির হারে একটা পরিবর্তন দেখা যাবে। তা কিন্তু দেখা যায়নি। পাঞ্জাব বা হরিয়ানার মতো কোনো অঞ্চলে হয়তো উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ওড়িশা বা অন্যান্য অঞ্চলে কিন্তু সবুজ বিপ্লবের কোনো প্রভাবই পড়েনি। সবুজ বিপ্লব কতটা সবুজ এ প্রশ্ন তুলে কেউ কেউ বলেন, গম উৎপাদনে, তাও কোনো কোনো রাজ্যে বিপ্লব ঘটলেও, ধান বা অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদনে এই বিপ্লবের কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায়নি। বাণিজ্যিক শস্য বা ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি তো পায়-ই নি বরং হ্রাস পেয়েছে, এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

সবুজ বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই কর্মযজ্ঞ ভারতের একটি অঞ্চলে আবদ্ধ (প্রধানত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে) অথচ এই বৈপ্লবিক প্রকল্পের জন্য কত দাম দিতে হয়। সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধের সমন্বয় ঘটানো যে কতটা খরচসাপেক্ষ তা বলাই বাহুল্য। জলসেচের জন্য, যন্ত্র ব্যবহারের জন্য, গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত ব্যয় তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে নতুন প্রযুক্তিকে নিরাপদে ব্যবহার করা, বীজ ও ফসলকে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের হাত থেকে বাঁচানোর সমস্যা। এত খরচ করে যে বৈপ্লবিক সমাধানের পথে সরকার অগ্রসর হল তার প্রাপ্তি কী? দু-পাঁচ বছর খাদ্যের ঘাটতি কমেছে, খাদ্য আমদানি কমেছে একথা ঠিক, কিন্তু অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে প্রত্যাশার তুলনায় প্রাপ্তি অনেক কম। রাসায়নিক সার তেমনভাবে পাওয়া যায়নি, নাইট্রোজেন উৎপাদনের হার ছিল অত্যন্ত কম, কীটনাশক ওষুধ জোগানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা চোখে পড়েছে। নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহারও প্রত্যাশামতো হয়নি। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনে দক্ষ ব্যক্তি নিয়োগ করা যায়নি। সাধারণ চাষি বা গরিব চাষি ব্যাংক বা সরকারের কাছ থেকে সহায়তা পেল না, সরকারি সাহায্যের সুযোগটা পুরোপুরি নিল সম্পন্ন চাষি।

রাষ্ট্রীয় খাত (Public Sector) এবং লাইসেন্স রাজ (License Raj)–

স্বাধীনোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দুটি শব্দবন্ধ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে সামনে আসে—'রাষ্ট্রীয় খাত' (Public Sector) এবং 'লাইসেন্স রাজ' (License Raj)। ১৯৪৭ সালে প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু এবং চরম দারিদ্র্যপীড়িত একটি দেশকে হাতে পেয়েছিলেন ভারতের তৎকালীন নীতিনির্ধারকরা। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে দেশের অর্থনীতিকে টেনে তোলার জন্য একটি নির্দিষ্ট পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল, যা ছিল মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Mixed Economy)। এই ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাষ্ট্রকে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয় এবং জন্ম নেয় এক বিশাল 'রাষ্ট্রীয় খাত'। অন্যদিকে, দেশের সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং বেসরকারি পুঁজির একচেটিয়া আধিপত্য রুখতে যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন ঘটে,

তা-ই ইতিহাসে 'লাইসেন্স রাজ' নামে পরিচিত। প্রায় চার দশক ধরে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করেছে এই দুটি ব্যবস্থা। ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক উদারীকরণের আগ পর্যন্ত এই নীতিগুলোভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড ও একই সাথে অগ্রগতির প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করেছে।

রাষ্ট্রীয় খাত (Public Sector): বিকাশের পটভূমি ও উদ্দেশ্য

স্বাধীনতার সময় ভারতের শিল্পভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। টাটা বা বিড়লার মতো হাতে গোনা কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠী ছাড়া বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগ করার মতো পুঁজি বা সাহস কোনোটিই বেসরকারি খাতের ছিল না। তাছাড়া, রাস্তাঘাট, রেলপথ, বিদ্যুৎ, বন্দর এবং যোগাযোগের মতো পরিকাঠামো খাতের উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন ছিল, যা থেকে নল্কাল কোনো মুনাফা পাওয়া সম্ভব ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের (Socialistic Pattern of Society) ওপর জোর দেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, ভারী ও মৌলিক শিল্পগুলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। তিনি এই রাষ্ট্রীয় খাতের কারখানা ও বাঁধগুলোকে "আধুনিক ভারতের মন্দির" বলে অভিহিত করেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় খাতের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

দ্রুত শিল্পায়ন: দেশের অর্থনীতিকে কৃষিভিত্তিক থেকে শিল্পভিত্তিক করে তোলার জন্য ইস্পাত, সার, ভারী যন্ত্রপাতি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো মৌলিক শিল্পগুলো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়।

আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ: বেসরকারি শিল্পপতিরা সাধারণত পরিকাঠামো উন্নত এমন অঞ্চলেই কারখানা স্থাপন করতে চায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় খাতের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের অবহেলিত ও অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করা (যেমন—ভিলাই, রৌরকেল্লা বা দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা স্থাপন)।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি: একটি সদ্য স্বাধীন দেশে বেকারত্ব দূর করা ছিল সরকারের প্রধান দায়িত্ব। রাষ্ট্রীয় খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিপুল পরিমাণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যা সামাজিক নিরাপত্তার কাজ করত।

জনকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার: মুনাফা অর্জন নয়, বরং সুলভ মূল্যে জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই খাতের মূল লক্ষ্য।

একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রণ: দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ যাতে অল্প কিছু শিল্পপতির হাতে কুক্ষিগত না হয়ে পড়ে, তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় খাতের সম্প্রসারণ জরুরি মনে করা হয়েছিল।

শিল্প নীতি প্রস্তাব (Industrial Policy Resolutions)

রাষ্ট্রীয় খাতের আইনি ও নীতিগত ভিত্তি তৈরি হয়েছিল মূলত ১৯৪৮ এবং ১৯৫৬ সালের শিল্প নীতি প্রস্তাবের (IPR) মাধ্যমে। বিশেষ করে ১৯৫৬ সালের নীতিটিকেভারতীয় অর্থনীতির "অর্থনৈতিক সংবিধান" বলা চলে। এই নীতিতে শিল্পগুলোকে তিনটি তালিকায় ভাগ করা হয়:

তালিকাবদ্ধ 'ক' (Schedule A): ১৭টি শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এর মধ্যে ছিল প্রতিরক্ষা, পারমাণবিক শক্তি, রেলপথ, বিমান পরিবহন, লোহা ও ইস্পাত এবং ভারী যন্ত্রপাতি।

তালিকাবদ্ধ 'খ' (Schedule B): ১২টি শিল্পকে রাখা হয় যেখানে রাষ্ট্র নতুন শিল্প স্থাপন করবে, তবে বেসরকারি খাতও রাষ্ট্রের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারবে। যেমন—সার, রাসায়নিক, সড়ক পরিবহন ইত্যাদি।

তালিকাবদ্ধ 'গ' (Schedule C): অবশিষ্ট শিল্পগুলো বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল, তবে তাও

কঠোর সরকারি নিয়মের অধীনে।

১৯৬৯ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১৪টি বড় বাণিজ্যিক ব্যাংকের জাতীয়করণ এবং পরবর্তী সময়ে কয়লা খনি ও বিমা কোম্পানির জাতীয়করণ রাষ্ট্রীয় খাতের ক্ষমতাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়।

লাইসেন্স রাজ (License Raj): নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল

রাষ্ট্রীয় খাতের সমান্তরালে বেসরকারি খাতের ওপর যে কঠোর এবং অত্যন্ত জটিল প্রশাসনিক ও আইনি নিয়ন্ত্রণ চাপিয়া দেওয়া হয়েছিল, তা-ই সাধারণভাবে 'লাইসেন্স রাজ' বা 'পারমিট-কোটা রাজ' নামে পরিচিত। বিশিষ্ট চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী (রাজাজী) প্রথম এই ব্যবস্থার সমালোচনা করে 'লাইসেন্স রাজ' শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৯৫১ সালের 'শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন' [Industries (Development and Regulation) Act, 1951]-এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়।

এই ব্যবস্থার মূল কথা ছিল—সরকারের পূর্ব অনুমতি বা 'লাইসেন্স' ছাড়া দেশের মাটিতে কোনো নতুন শিল্প স্থাপন করা যাবে না, বিদ্যমান কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো যাবে না এবং পণ্যের বৈচিত্র্যকরণও (Diversification) করা যাবে না।

লাইসেন্স রাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

উৎপাদন কোটা নির্ধারণ: সরকার ঠিক করে দিত একটি কোম্পানি বছরে ঠিক কতটুকু পণ্য উৎপাদন করতে পারবে। দেশের চাহিদা যতই থাকুক না কেন, কোটার অতিরিক্ত উৎপাদন করা ছিল বেআইনি।

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ: বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করতে আমদানি ব্যবস্থার ওপর কঠোর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিল। 'আমদানি প্রতিস্থাপন' (Import Substitution) নীতির মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হতো। কোনো যন্ত্রপাতি বা কাঁচামাল বিদেশ থেকে আনতে গেলে আমলতান্ত্রিক জটিলতার শেষ ছিল না।

MRTP আইন (1969): মনোপলিজ অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস (MRTP) আইনের অধীনে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি সম্পদশালী কোম্পানিগুলোকে 'MRTP কোম্পানি' হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এদের নতুন কোনো ব্যবসা শুরু বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব সব শর্ত পার হতে হতো।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ: নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন চিনি, সিমেন্ট, ওষুধ ও ইস্পাতের দাম সরকার নির্ধারণ করে দিত, যার ফলে উৎপাদনকারীরা অনেক সময় উৎপাদন খরচও তুলতে পারত না।

রাষ্ট্রীয় খাত ও লাইসেন্স রাজের ইতিবাচক অবদান

আজকের মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে দাঁড়িয়ে এই ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করা সহজ হলেও, সেই সময়ের বাস্তবতায় এর কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক অবদান ছিল, যা অস্বীকার করা যায় না।

মৌলিক পরিকাঠামো নির্মাণ: লাইসেন্স রাজ ও রাষ্ট্রীয় খাতের যৌথ প্রয়াসেই ভারতের মতো বিশাল দেশে রেল যোগাযোগ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৃহৎ বাঁধ (যেমন ভাকরা-নাঙ্গাল), বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ভারী ইস্পাত কারখানার এক বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। বেসরকারি খাতের পক্ষে এই বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করা তখন অসম্ভব ছিল।

আত্মনির্ভরশীলতা (Self-Reliance): ভারতের মতো সদ্য স্বাধীন দেশকে বিদেশী অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল এই সুরক্ষাবাদী নীতি। দেশেই মহাকাশ গবেষণা (ISRO), পারমাণবিক শক্তি এবং প্রতিরক্ষার মতো স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রযুক্তি ও সক্ষমতা তৈরি হয়েছিল রাষ্ট্রীয় খাতের হাত ধরেই।

সবুজ বিপ্লবের ভিত্তি: রাষ্ট্রীয় খাতের উদ্যোগে তৈরি সার কারখানা, সেচ প্রকল্প এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ দেওয়ার ফলেই ১৯৬০-এর দশকে ভারতে সবুজ বিপ্লব সফল হয় এবং দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি: আইআইটি (IIT), আইআইএম (IIM) এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত গবেষণাগার সরকারি অর্থায়নেই গড়ে উঠেছিল, যা আজ বিশ্বমঞ্চে ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি—দক্ষ ও শিক্ষিত মানবসম্পদ।

ব্যবস্থার অবক্ষয়: কেন ব্যর্থ হলো এই নীতি?

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে এসে এই নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক মডেলের ভেতরের গলদগুলো প্রকট হতে শুরু করে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল, তা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি এবং অদক্ষতার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়।

রাষ্ট্রীয় খাতের অদক্ষতা ও লোকসান

রাষ্ট্রীয় খাতের প্রধান সমস্যা ছিল পেশাদারিত্বের অভাব। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়ের নিয়মে না চলে আমলা ও রাজনীতিবিদদের নির্দেশে চলত। ফলে নিচের সমস্যাগুলো দেখা দেয়:

'শ্বেত হস্তী' বা লোকসানি প্রতিষ্ঠান: বহু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বছরের পর বছর ধরে বিপুল লোকসান করতে থাকে, যা সরকারি রাজকোষের ওপর বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এই সংস্থাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে জনগণের ট্যাক্সের টাকা ঢালতে হতো।

জবাবদিহিতার অভাব: সরকারি চাকরিতে স্থায়িত্বের কারণে কর্মচারীদের মধ্যে কাজের প্রতি অনীহা ও অদক্ষতা তৈরি হয়। "সবার সম্পত্তি মানে কারও সম্পত্তি নয়"—এই মানসিকতা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে গ্রাস করে।

political হস্তক্ষেপ: অলাভজনক হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক স্বার্থে নতুন প্রকল্প নেওয়া হতো বা অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করা হতো, যা উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দিত।

লাইসেন্স রাজের কুফল ও অর্থনীতির স্থবিরতা

লাইসেন্স রাজ ভারতের উদ্যোক্তা মানসিকতা এবং উদ্ভাবনী শক্তিকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। এর ফলে নিম্নলিখিত মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়:

দুর্নীতি ও 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম': লাইসেন্স পাওয়ার জন্য দিল্লির সরকারি দপ্তরে আমলা ও মন্ত্রীদের ঘুষ দেওয়া রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। বড় বড় শিল্পপতিরা আমলাদের হাত করে লাইসেন্স নিজেদের নামে করে রাখত, যাতে কোনো নতুন প্রতিযোগী বাজারে আসতে না পারে। একেই বলে 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম' বা সুবিধাভোগী পুঁজিবাদ।

প্রতিযোগিতার অভাব ও নিম্নমানের পণ্য: বিদেশী পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং দেশীয় বাজারে নতুন প্রতিযোগী আসার পথ বন্ধ থাকায় বিদ্যমান কোম্পানিগুলো পণ্যের মানোন্নয়নে কোনো নজর দেয়নি। ক্রেতাদের বছরের পর বছর ধরে অ্যাম্বাসেডর গাড়ি বা প্রিমিয়ার পদ্মিনী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হতো, যার প্রযুক্তিতে কোনো বদল আসত না। কোয়ালিটি বা মানের চেয়ে স্রেফ 'লাইসেন্স' থাকাই ব্যবসার সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'হিঁদু বৃদ্ধির হার' (Hindu Rate of Growth): এই কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে ভারতের জিডিপি (GDP) বৃদ্ধির হার ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত গড়ে বার্ষিক মাত্র ৩.৫% এর কাছাকাছি আটকে ছিল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রাজ কৃষ্ণ এই মন্থরগতির বৃদ্ধিকে উপহাস করে 'হিঁদু বৃদ্ধির হার' বলে অভিহিত করেছিলেন।

সংকটের চূড়া এবং ১৯৯১ সালের ঐতিহাসিক মোড়

১৯৮০-এর দশকের শেষভাগে ভারতের অর্থনীতি এক গভীর সংকটের মুখে পড়ে। সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বিপুল ঘাটতি (Fiscal Deficit) দেখা দেয় এবং পারস্য উপসাগরীয় সংকটের (Gulf War) কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আকাশচুম্বী হলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার একবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকে।

১৯৯১ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের কাছে মাত্র দুই সপ্তাহের আমদানি খরচ মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রা (Foreign Exchange Reserve) অবশিষ্ট ছিল। এই চরম আর্থিক দেউলিয়াত্ব থেকে বাঁচতে ভারতকে তার রিজার্ভ ব্যাংক থেকে সোনা বিদেশে (লন্ডন ও সুইজারল্যান্ডে) বন্ধক রেখে ঋণ নিতে হয়েছিল। এই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার শর্ত হিসেবেই ভারতকে তার গভীর অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে ফেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

১৯৯১ সালের ২৪শে জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাও এবং অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বিপ্লবী বাজেট পেশ করেন, যার মাধ্যমে সূচনা হয় LPG অর্থাৎ:

Liberalization (উদারীকরণ): লাইসেন্স রাজের অবসান।

Privatization (বেসরকারীকরণ): রাষ্ট্রীয় খাতের ভূমিকা সংকোচন এবং বিলগ্নীকরণ।

Globalization (বিশ্বায়ন): বিশ্ব অর্থনীতির সাথে ভারতের অর্থনীতিকে যুক্ত করা।

নতুন শিল্প নীতি (New Industrial Policy, 1991)

এই নীতির মাধ্যমে লাইসেন্স রাজের অবসান ঘটানো হয়। মাত্র কয়েকটি সংবেদনশীল শিল্প (যেমন প্রতিরক্ষা, পারমাণবিক শক্তি, বিপজ্জনক রাসায়নিক) ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্র থেকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সিং ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় খাতের জন্য সংরক্ষিত শিল্পের সংখ্যা ১৭ থেকে কমিয়ে মাত্র ৩টিতে নামিয়ে আনা হয়। বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় টেলিকম, বিমান পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং ব্যাংকিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো।

রাষ্ট্রীয় খাত এবং লাইসেন্স রাজের চার দশকের অভিজ্ঞতা ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক মিশ্র অধ্যায়। একদিকে যেমন এই নীতি ভারতকে একটি শক্ত পরিকাঠামো ও আত্মনির্ভরশীলতার ভিত গড়ে দিয়েছিল, অন্যদিকে কঠোর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত হতে দেয়নি।

পরবর্তী সময়ে ১৯৯১ সালের সংস্কারের পর যখন লাইসেন্স রাজের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলা হলো, তখন ভারতীয় বেসরকারি খাতের ভেতরের সুপ্ত শক্তি বিশ্বমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করল। ভারত বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হলো। আজ রাষ্ট্রীয় খাতের ভূমিকা অনেকটাই পরিবর্তিত; সরকার এখন আর নিজে ব্যবসা করার চেয়ে নীতি নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রকের (Regulator) ভূমিকা palane বেশি আগ্রহী। তবে আজকের ভারতের এই অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়ে ওঠার পেছনে অতীতেরই সেই রাষ্ট্রীয় খাতের তৈরি করা দক্ষ জনবল এবং মৌলিক পরিকাঠামোর অবদানকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখা যায় না। এটি ছিল একটি প্রয়োজনীয় পর্যায়, যার ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়েই আজকের আধুনিক ও গতিশীল ভারতের জন্ম হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্র কেবল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে (যেমন প্রতিরক্ষা, পরমাণু শক্তি, রেলওয়ে) নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছে। অন্যদিকে, লাইসেন্স রাজের অবসানের ফলে ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পাবলিক সেক্টর এবং লাইসেন্স রাজ এক সময় ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনে সাহায্য করলেও, সময়ের সাথে সাথে তা অর্থনীতির গতি রোধকারী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৯১ সালের সংস্কার ভারতের জন্য এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। তবে আজও জনকল্যাণ এবং

অবকাঠামো উন্নয়নে পাবলিক সেক্টরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, তবে তা হতে হবে আরও স্বচ্ছ, দক্ষ এবং প্রতিযোগিতামূলক।

১৯৯১ পরবর্তী ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার

১৯৯১ সাল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি জলবিভাজক রেখা। এই বছর ভারত তার চিরাচরিত ‘লাইসেন্স পারমিট রাজ’ বা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের বদ্ধ অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে এসে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়নের (LPG - Liberalization, Privatization, and Globalization) পথে পা বাড়ায়। এই আমূল পরিবর্তনের পেছনে কোনো একটি কারণ ছিল না, বরং অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বহুবিধ কারণের এক জটিল সমীকরণ কাজ করেছিল।

১. তীব্র অর্থপ্রদান ভারসাম্য সংকট (Balance of Payments Crisis)

১৯৯১ সালের সংস্কারের তাৎক্ষণিক ও প্রধান কারণ ছিল বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র সংকট। ভারতের আমদানির পরিমাণ রপ্তানির তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ভারতের কাছে থাকা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মাত্র দুই সপ্তাহের আমদানির খরচ মেটানোর জন্য অবশিষ্ট ছিল। ভারত তার আন্তর্জাতিক ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে অসমর্থ হয়ে পড়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে এবং দেউলিয়া হওয়া আটকাতে তৎকালীন সরকার স্বর্ণ বন্ধক রেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে আইএমএফ (IMF) ও বিশ্বব্যাংকের শর্ত অনুযায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠনে রাজি হয়।

২. সরকারি খাতের অদক্ষতা ও লোকসান

স্বাধীনতার পর থেকে ভারত ‘নেহেরুভিয়ান’ মডেলে বিশ্বাসী ছিল, যেখানে ভারী শিল্প ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের (PSUs) অধীনে ছিল। দীর্ঘ চার দশকে দেখা গেল, এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সিংহভাগই অত্যন্ত অদক্ষ, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং লোকসানে চলছে। করদাতার টাকা দিয়ে বছরের পর বছর এই অলাভজনক সংস্থাগুলোকে টিকিয়ে রাখা অর্থনীতির জন্য বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারি একচেটিয়া আধিপত্যের ফলে প্রতিযোগিতার অভাব ছিল, যা গুণগত মান এবং উদ্ভাবন—উভয়কেই বাধাগ্রস্ত করছিল।

৩. উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও রাজস্ব ঘাটতি

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার ১৩ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল সরকারের লাগামহীন খরচ। উন্নয়নমূলক কাজের চেয়ে প্রশাসনিক এবং ভর্তুকি সংক্রান্ত খরচ এত বেড়ে গিয়েছিল যে সরকারের ‘রাজস্ব ঘাটতি’ (Fiscal Deficit) জিডিপির প্রায় ৮.৪ শতাংশে পৌঁছেছিল। অভ্যন্তরীণ ঋণের চাপ কমানোর জন্য নতুন করে টাকা ছাপানো মুদ্রাস্ফীতিকে আরও উসকে দিয়েছিল।

৪. লাইসেন্স রাজ ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

১৯৯১ সালের আগে ভারতে যেকোনো ব্যবসা শুরু বা সম্প্রসারণ করতে গেলে সরকারের কাছ থেকে অসংখ্য অনুমতি বা লাইসেন্স নিতে হতো। এই ‘লাইসেন্স-পারমিট-কোটা রাজ’ উদ্যোক্তাদের নিরুৎসাহিত করত। বেসরকারি বিনিয়োগের পথে এটি ছিল এক দুর্ভেদ্য দেয়াল। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা এবং দুর্নীতির ফলে উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছিল, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের হারকে (যা ‘হিন্দু রেট অফ গ্রোথ’ নামে পরিচিত ছিল) নিম্নমুখী করে রেখেছিল।

৫. আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বৈশ্বিক রাজনীতিতেও বড় পরিবর্তন আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে, যা ছিল ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অংশীদার। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো (যেমন—দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, সিঙ্গাপুর) উন্মুক্ত বাজার নীতি গ্রহণ করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি করছিল। এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ভারতকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, আত্মনির্ভরশীলতার নামে বিচ্ছিন্ন থাকা আর সম্ভব নয়।

সংস্কারের মূল স্তম্ভসমূহ

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি.ভি. নরসিমা রাও এবং অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং যে সংস্কার নীতি গ্রহণ করেন, তার তিনটি প্রধান দিক ছিল:

উদারীকরণ (Liberalization): লাইসেন্স রাজের অবসান ঘটানো, সুদের হার নির্ধারণে বাজারের স্বাধীনতা দেওয়া এবং ব্যবসায়িক বিধিনিষেধ শিথিল করা।

বেসরকারীকরণ (Privatization): সরকারি খাতের বিলগ্নীকরণ এবং বেসরকারি ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করা যাতে কর্মদক্ষতা বাড়ে।

বিশ্বায়ন (Globalization): ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে যুক্ত করা। শুল্ক হার কমানো এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) পথ প্

১৯৯১ সালের সংস্কার ভারতকে একটি ধীরগতির অর্থনীতি থেকে দ্রুততম ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে। এর ইতিবাচক দিকগুলো হলো:

১. জিডিপি বৃদ্ধি: সংস্কারের পর ভারতের গড় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ২-৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭-৮ শতাংশে পৌঁছায়।

২. বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার: ১৯৯১ সালে যেখানে মাত্র ১ বিলিয়ন ডলার ছিল, আজ তা ৬০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

৩. দারিদ্র্য বিমোচন: যদিও বৈষম্য বেড়েছে, তবুও কয়েক কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে আসতে পেরেছে।

৪. পরিষেবা খাতের উন্নতি: আইটি (IT) এবং টেলিকম খাতে ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দেশ।

১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কার কেবল প্রয়োজনেই করা হয়নি, এটি ছিল সময়ের দাবি। যদিও এর ফলে কৃষি ক্ষেত্রে সংকট বা ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্যের মতো কিছু নেতিবাচক দিক উঠে এসেছে, তবে ভারতের আজকের শক্তিশালী বৈশ্বিক অবস্থানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল সেই সংকটের দিনগুলিতেই। ভারতের জন্য এই সংস্কার ছিল এক ‘অগ্নিপরীক্ষা’, যা সফলভাবে পার করে দেশটি আজ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে।

রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল ভূমিকা: নিয়ন্ত্রক থেকে সহায়তাকারী"

(Changing Role of the State: Controller to Facilitator)।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ্বায়নের (Globalization) যুগে রাষ্ট্রের সনাতনী ধারণায় এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। অতীতে রাষ্ট্র যেখানে ছিল সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক' (Controller) বা নির্দেশক, বর্তমান যুগে সেই ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে রাষ্ট্র পরিণত হয়েছে একটি 'সহায়তাকারী' (Facilitator) বা অনুঘটকে। মূলত ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কার (উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়ন বা LPG) এবং 'নব্য উদারনীতিবাদের' (Neo-liberalism) উত্থানের ফলে রাষ্ট্রের এই রূপান্তর ঘটেছে।

১. নিয়ন্ত্রক হিসেবে রাষ্ট্র (State as a Controller)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রে (বিশেষ করে ভারতের মতো মিশ্র অর্থনীতিতে) রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল প্রধানত নিয়ন্ত্রকের।

লাইসেন্স রাজ ও কঠোর নিয়মাবলী: ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন এবং আমদানির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল। কোনো নতুন শিল্প গড়ার জন্য সরকারের অনুমতি বা লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা: উৎপাদন ও বণ্টনের মূল চাবিকাঠি ছিল সরকারের হাতে। ভারী শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে (Public Sector) ছিল।

জনকল্যাণকামী রূপের আড়ালে আমলাতান্ত্রিকতা: রাষ্ট্রকে 'কল্যাণকামী রাষ্ট্র' (Welfare State) বলা হলেও, অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা (Red Tapism) এবং দুর্নীতির জন্ম হয়েছিল, যা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিকে মন্থর করে দেয়।

২. সহায়তাকারী হিসেবে রাষ্ট্র (State as a Facilitator)

১৯৯০-এর দশকের পর থেকে রাষ্ট্র তার নিজের ভূমিকা পুনর্বিন্যাস করে। রাষ্ট্র এখন বাজার বা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে তাদের বিকাশে সাহায্য করে।

উদারীকরণ (Liberalization): রাষ্ট্র এখন কঠিন নিয়মকানুনের বেড়াজাল ভেঙে ব্যবসা-বাণিজ্যকে সহজ করে তুলেছে (Ease of Doing Business)। লাইসেন্স প্রথার অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বাজারের ক্ষমতায়ন (Market Empowerment): রাষ্ট্র এখন নিজেই সব পণ্য উৎপাদন করে না। উৎপাদন ও পরিষেবার দায়িত্ব বেসরকারি ক্ষেত্রের (Private Sector) হাতে ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্র কেবল বাজারের সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখার দিকে নজর দেয়।

অবকাঠামো উন্নয়ন (Infrastructure Development): সহায়তাকারী হিসেবে রাষ্ট্রের মূল কাজ হলো—উন্নত রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং আইনি সুরক্ষা প্রদান করা, যাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

নিয়ন্ত্রক থেকে নিয়ন্ত্রক সংস্থায় রূপান্তর (Regulator to Regulatory Bodies): রাষ্ট্র সরাসরি নিয়ন্ত্রণ না করে

বিভিন্ন স্বাধীন স্বশাসিত সংস্থা তৈরি করেছে। যেমন ভারতে—টেলিকম সেক্টরের জন্য TRAI, শেয়ার বাজারের জন্য SEBI, বা বীমা ক্ষেত্রের জন্য IRDAI। এরা বাজারের অভিভাবক বা রেফারি হিসেবে কাজ করে, খেলোয়াড় হিসেবে নয়।

৩. এই পরিবর্তনের কারণসমূহ (Reasons for the Shift)

বিশ্বায়ন এবং আন্তর্জাতিক চাপ: IMF, বিশ্বব্যাংক (World Bank) এবং WTO-র মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির শর্ত মেনে রাষ্ট্রগুলিকে তাদের অর্থনীতি উন্মুক্ত করতে হয়েছে।

দক্ষতা বৃদ্ধি: দেখা গেছে যে, ব্যবসা পরিচালনা করার চেয়ে রাষ্ট্র যদি নীতি নির্ধারণে মন দেয়, তবে তা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বেশি কার্যকর হয়।

প্রযুক্তির বিপ্লব: তথ্যপ্রযুক্তির (IT) উন্নতির ফলে নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়া সহজ হয়েছে এবং রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা কমেছে।

৪. সহায়তাকারী রাষ্ট্রের সমালোচনা (Critical Assessment)

যদিও সহায়তাকারী ভূমিকা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য সহায়ক, তবুও এর কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে:সামাজিক অসমতা: রাষ্ট্র উৎপাদন থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে, যার ফলে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ছে।জনকল্যাণ থেকে পিছু হটা: পুঁজিপতিদের সুবিধা দিতে গিয়ে রাষ্ট্র অনেক সময় প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রের ভূমিকা 'নিয়ন্ত্রক' থেকে 'সহায়তাকারী'-তে পরিবর্তিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রের গুরুত্ব কমে গেছে। বরং রাষ্ট্রের দায়িত্ব এখন আরও পরিশীলিত ও জটিল হয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় (Good Governance) রাষ্ট্র এখন আর আদেশদাতা নয়, বরং সে সমাজ ও অর্থনীতির এক বিশ্বস্ত সহযোগী পথপ্রদর্শক।

ভারতীয় দূরসঞ্চার নিয়ামক কর্তৃপক্ষ (TRAI)

TRAI-এর পুরো নাম: Telecom Regulatory Authority of India (টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া) ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ভারতে অর্থনৈতিক উদারীকরণের হাওয়া বইতে শুরু করে। এর আগে পর্যন্ত ভারতের দূরসঞ্চার বা টেলিকম ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৯৪ সালে সরকার প্রথম 'জাতীয় টেলিকম নীতি' (National Telecom Policy) ঘোষণা করে, যার লক্ষ্য ছিল টেলিকম ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।

বেসরকারি সংস্থাগুলো বাজারে আসার পর একটি নিরপেক্ষ নিয়ামক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়, যা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমতা বজায় রাখবে এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করবে। এই উদ্দেশ্যে, TRAI আইন, ১৯৯৭-এর অধীনে ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ সালে একটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে TRAI প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালে এই আইন সংশোধন করে একটি জুডিশিয়াল বডি বা বিচার বিভাগীয় সংস্থা হিসেবে TDSAT (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal) গঠন করা হয়, যাতে টেলিকম ক্ষেত্রের আইনি বিবাদগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়।

প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

TRAI-এর মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যাতে দূরসঞ্চার ও ব্রডকাস্ট শিল্প অত্যন্ত দ্রুত এবং স্বচ্ছতার সাথে বৃদ্ধি পেতে পারে, যা ভারতকে বিশ্বমঞ্চে একটি অন্যতম ডিজিটাল শক্তি হিসেবে গড়ে তুলবে। এর প্রধান কার্যাবলী নিচে আলোচনা করা হলো:

ক) শুল্ক বা ট্যারিফ নিয়ন্ত্রণ (Tariff Regulation)

টেলিকম অপারেটররা (যেমন- Jio, Airtel, Vi) গ্রাহকদের কাছ থেকে কল, ডেটা বা SMS-এর জন্য কত টাকা চার্জ করবে, তার ওপর নজরদারি রাখে TRAI। বাজারে যাতে কোনো মনোপলি বা একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি না হয় এবং সংস্থাগুলো যাতে জোটবদ্ধ হয়ে (Cartelization) দাম বাড়িয়ে গ্রাহকদের শোষণ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা TRAI-এর কাজ।

খ) পরিষেবার গুণগত মান (Quality of Service - QoS)

গ্রাহকরা ঠিকমতো নেটওয়ার্ক পাচ্ছেন কি না, কল ড্রপ (Call Drop) হচ্ছে কি না, ইন্টারনেটের গতি চুক্তি অনুযায়ী milছে কি না—এই সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করার জন্য TRAI নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়। কোনো অপারেটর এই মানদণ্ড বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে তাদের ওপর বড় অঙ্কের জরিমানা আরোপ করা হয়।

গ) সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখা (Fair Competition)

টেলিকম বাজারে নতুন ও পুরনো সব সংস্থাই যাতে সমান সুযোগ পায়, তা দেখা TRAI-এর আইনি দায়িত্ব। কোনো বড় সংস্থা যাতে অত্যন্ত কম বা শিকারী মূল্য (Predatory Pricing) নির্ধারণ করে ছোট প্রতিদ্বন্দীদের বাজার থেকে তাড়িয়ে দিতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হয়।

ঘ) গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষা

ভোক্তা বা গ্রাহকদের অধিকার রক্ষা করা TRAI-এর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। উদাহরণস্বরূপ, গ্রাহকদের সম্মতি ছাড়া কোনো ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (Value Added Services - VAS) বা কলার টিউন চালু করে টাকা কেটে নেওয়া যাবে না—এমন কড়া নিয়ম তৈরি করেছে এই সংস্থা। এছাড়া উত্যক্তকারী বা স্প্যাম কল ও মেসেজ বন্ধ করতে DND (Do Not Disturb) রেজিস্ট্রি ব্যবস্থা চালু করা এর একটি বড় সাফল্য।

সাংগঠনিক কাঠামো

TRAI-এর সদর দপ্তর নতুন দিল্লিতে অবস্থিত। এটি মূলত একটি চেয়ারম্যান, সর্বোচ্চ দুজন পূর্ণসময়ের সদস্য এবং অনধিক দুজন পার্ট-টাইম বা খণ্ডকালীন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই সমস্ত সদস্যদের নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার। সাধারণত দূরসঞ্চার, প্রশাসন, অর্থ বা আইন ক্ষেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই এই পদে মনোনীত করা হয়।

ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরে TRAI-এর ভূমিকা

বর্তমান ভারতের ৫জি (5G) বিপ্লব, সস্তা ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া (Digital India) গড়ার পেছনে TRAI-এর নীতিগত সিদ্ধান্তগুলোর অবদান অনস্বীকার্য।

স্পেকট্রাম বা তরঙ্গের নিলাম: সরকারের কাছে স্পেকট্রামের মূল্য নির্ধারণ এবং কীভাবে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় তরঙ্গের নিলাম (Spectrum Auction) করা হবে, তার সুপারিশ তৈরি করে TRAI।

নেট নিউট্রালিটি (Net Neutrality): ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা বা 'নেট নিউট্রালিটি'র পক্ষে অত্যন্ত শক্ত অবস্থান নিয়েছে TRAI। এর ফলে ইন্টারনেট প্রদানকারী সংস্থাগুলো নির্দিষ্ট কোনো

ওয়েবসাইট বা অ্যাপের গতি বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে না; সবার জন্য ইন্টারনেট সমান।

মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি (MNP): নিজের মোবাইল নম্বর না বদলে এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিতে চলে যাওয়ার (MNP) যে সুবিধা আজ আমরা ভোগ করছি, তা সম্পূর্ণভাবে TRAI-এর যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফসল।

বর্তমান挑戰সমূহ (Current Challenges)

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সাথে TRAI-এর সামনে বেশ কিছু নতুন挑戰 এসে দাঁড়িয়েছে:

OTT প্ল্যাটফর্মের নিয়ন্ত্রণ: WhatsApp, Telegram, Signal-এর মতো OTT (Over-The-Top) অ্যাপগুলো টেলিকম অপারেটরদের মতো কলিং ও মেসেজিং পরিষেবা দিলেও তারা প্রথাগত টেলিকম নিয়মের বাইরে থাকে। এদের কীভাবে নিয়মের আওতায় আনা যায়, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে।

টেলিকম ক্ষেত্রের আর্থিক সংকট: বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে অনেক সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে বা দেউলিয়া হয়ে গেছে। বর্তমানে বাজারে মাত্র ৩টি বেসরকারি এবং ১টি সরকারি (BSNL) সংস্থা টিকে রয়েছে। এই ডুয়োপলি বা ট্রায়োপলি বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখা বেশ কঠিন।

সাইবার নিরাপত্তা ও ডেটা গোপনীয়তা: কোটি কোটি গ্রাহকের ডেটা সুরক্ষিত রাখা এবং স্প্যাম কল/লিঙ্ক পাঠিয়ে আর্থিক জালিয়াতি রোখার জন্য নিত্যনতুন প্রযুক্তিগত সমাধান খোঁজা এখন TRAI-এর জন্য বড় পরীক্ষা।

ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড (SEBI)

SEBI-এর পুরো নাম: Securities and Exchange Board of India (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া) ভারতের শেয়ার বাজার ও সামগ্রিক পুঁজিবাজারের (Capital Market) অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হলো SEBI। ভারতের স্বাধীনতার পর থেকেই শেয়ার বাজার সচল থাকলেও সেখানে কোনো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা ছিল না। প্রাথমিকভাবে ১৯৮৮ সালে একটি অ-সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে SEBI গঠিত হলেও, ১৯৯২ সালের শুরুতে ভারতে ঘটে যাওয়া ভয়ংকর 'হর্ষদ মেহতা শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি' পুরো দেশের আর্থিক ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা রাতারাতি গায়েব হয়ে যায় এবং শেয়ার বাজারের ওপর থেকে জনগণের বিশ্বাস সম্পূর্ণ উঠে যায়।

এই চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে পুঁজিবাজারকে দুর্নীতিমুক্ত করতে এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা দিতে ১৯৯২ সালের ১২ই এপ্রিল SEBI আইন, ১৯৯২ পাস করা হয় এবং SEBI-কে ব্যাপক আইনি ও সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতা (Statutory Powers) প্রদান করা হয়।

প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

SEBI-এর মূল কাজকে একটি ত্রিমুখী ভূমিকা হিসেবে দেখা যায়। এটি একই সাথে তিন ধরণের গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করে: বিনিয়োগকারী (Investors), সিকিউরিটিজ ইস্যুকারী বা তালিকাভুক্ত কোম্পানি (Issuers of Securities), এবং বাজার মধ্যস্থতাকারী যেমন ব্রোকার বা সাব-ব্রোকার (Market Intermediaries)।

ক) বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা

SEBI-এর এক নম্বর অগ্রাধিকার হলো সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা। শেয়ার বাজারে যাতে কোনো রকম জালিয়াতি বা প্রতারণা না হয়, তা নিশ্চিত করা SEBI-এর দায়িত্ব। বিনিয়োগকারীদের শিক্ষিত করতে এটি বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালায়।

খ) ইনসাইডার ট্রেডিং রোধ (Prohibition of Insider Trading)

শেয়ার বাজারের অন্যতম বড় অপরাধ হলো ইনসাইডার ট্রেডিং। কোনো কোম্পানির ভেতরের কোনো গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (যা সাধারণ মানুষ বা বিনিয়োগকারীরা এখনও জানেন না) ব্যবহার করে যদি কোম্পানির কোনো আধিকারিক বা তাদের পরিচিত কেউ শেয়ার কেনাবেচা করে বিপুল মুনাফা অর্জন করে, তাকে ইনসাইডার ট্রেডিং বলে। SEBI অত্যন্ত কঠোরভাবে এই অপরাধ দমন করে এবং দোষীদের কোটি কোটি টাকা জরিমানা ও জেল হেফাজত পর্যন্ত করতে পারে।

গ) বাজার মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রণ ও নিবন্ধন

শেয়ার বাজারের সাথে যুক্ত সমস্ত ব্রোকার (যেমন- Zerodha, Groww, Angel One), সাব-ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, মিউচুয়াল ফান্ড সংস্থা (AMC), এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজারদের SEBI-এর কাছে নিবন্ধিত হতে হয়। এদের জন্য কঠোর আচরণবিধি (Code of Conduct) নির্ধারণ করে দেওয়া আছে, যা অমান্য করলে লাইসেন্স বাতিল হতে পারে।

ঘ) কোম্পানির আইপিও (IPO) ও তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ

কোনো কোম্পানি যখন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলার জন্য বাজারে প্রথমবার শেয়ার ছাড়ে (Initial Public Offering বা IPO), তখন তাদের SEBI-এর কাছে সমস্ত আর্থিক খতিয়ান জমা দিতে হয়। কোম্পানিটি কোনো তথ্য গোপন করছে কি না বা মিথ্যে তথ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলছে কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে তবেই আইপিও-র অনুমতি দেয় SEBI।

SEBI-এর অনন্য ক্ষমতা (Powers of SEBI)

SEBI-এর কাছে তিনটি প্রধান ক্ষমতা রয়েছে, যা তাকে ভারতের অন্যতম শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত করেছে:

১. Legislative (আইন প্রণয়ন ক্ষমতা): শেয়ার বাজারের সুরক্ষার্থে এটি নিজস্ব নিয়ম ও আইন তৈরি করতে পারে।

২. Judicial (বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা): শেয়ার বাজারে কোনো জালিয়াতি বা অনিয়ম হলে SEBI নিজেই তার বিচার করতে পারে এবং আদেশ জারি করতে পারে।

৩. Executive (কার্যকরী ক্ষমতা): যেকোনো সন্দেহভাজন কোম্পানির অ্যাকাউন্ট বুক বা আর্থিক খতিয়ান তদন্ত করার, এবং প্রয়োজনে ডিজিটাল প্রমাণ বা নথি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা এর রয়েছে।

ভারতের অর্থনীতি ও মিউচুয়াল ফান্ডে SEBI-এর অবদান

আজ ভারতের কোটি কোটি মানুষ যে নিশ্চিন্তে মিউচুয়াল ফান্ডে SIP (Sustainable Investment Plan) করছেন, তার পেছনে রয়েছে SEBI-এর কঠোর ও স্বচ্ছ নিয়মাবলি।

মিউচুয়াল ফান্ডের সরলীকরণ: SEBI মিউচুয়াল ফান্ডের সমস্ত স্কিমকে নির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দিয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারেন তারা কোথায় টাকা রাখছেন। এছাড়া মিউচুয়াল ফান্ডের অতিরিক্ত চার্জ বা এক্সপেন্স রেশিও (Expense Ratio)-র ওপর সিলিং বা সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়েছে।

অ্যালগো ট্রেডিং ও প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ: ভারতীয় শেয়ার বাজার আজ বিশ্বের অন্যতম উন্নত ও প্রযুক্তিগতভাবে নিরাপদ বাজার। T+1 সেটলমেন্ট (অর্থাৎ শেয়ার বিক্রি করার ১ দিনের মধ্যে টাকা অ্যাকাউন্টে আসা) চালু করার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান বিশ্বে অগ্রগামী, যা SEBI-এর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান挑戦সমূহ (Current Challenges)

সোশ্যাল মিডিয়া ও ফিনফ্লুয়েন্সার (Finfluencers): বর্তমানে YouTube, Telegram বা Instagram-এ বহু স্বঘোষিত আর্থিক বিশেষজ্ঞ বা 'ফিনফ্লুয়েন্সার' কোনো লাইসেন্স ছাড়াই সাধারণ মানুষকে নির্দিষ্ট শেয়ার কেনার ভুল বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরামর্শ (Tips) দিয়ে থাকেন। এদের নিয়ন্ত্রণ করা SEBI-এর জন্য একটি বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শর্ট সেলিং ও বিদেশী রিপোর্টের প্রভাব: মার্কিন সংস্থা 'হিন্ডেনবার্গ'-এর মতো বিদেশি শর্ট-সেলারদের রিপোর্টের কারণে যখন ভারতীয় বাজারে তীব্র ধস নামে, তখন ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের আতঙ্ক থেকে রক্ষা করা এবং বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা বড়挑戦।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ও ブロックチェーン: ডিজিটাল অ্যাসেট বা ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা প্রথাগত পুঁজিবাজারের জন্য挑戦 তৈরি করছে, কারণ এগুলো কোনো নির্দিষ্ট দেশের সীমানা বা নিয়মের তোয়াক্কা করে না।

৩.

বীমা নিয়ামক ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (IRDAI)

IRDA-এর পুরো নাম: Insurance Regulatory and Development Authority of India (ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া)

১৯৯৯ সালের আগে পর্যন্ত ভারতের বীমা বা ইন্সুরেন্স ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত বা সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। জীবন বীমার জন্য ছিল LIC এবং সাধারণ বীমার জন্য ছিল GIC ও তার সহযোগী সংস্থাসমূহ। এই একচেটিয়া ব্যবস্থার কারণে সাধারণ মানুষ উন্নত পরিষেবা এবং বৈচিত্র্যময় বীমা পলিসি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। বীমা ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণ এবং বেসরকারি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করতে ভারত সরকার ১৯৯৩ সালে আরবিআই-এর প্রাক্তন গভর্নর আর. এন. মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে।

মালহোত্রা কমিটির সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ১৯৯৯ সালে সংসদে IRDA আইন, ১৯৯৯ পাস হয় এবং ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে একটি সংবিধিবদ্ধ স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে IRDA (বর্তমানে IRDAI) আত্মপ্রকাশ করে। এর সদর দপ্তর প্রথমদিকে দিল্লিতে থাকলেও ২০০১ সালে তা তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

IRDAI-এর মূল উদ্দেশ্য দুটি—প্রথমত, বীমা পলিসি গ্রাহকদের (Policyholders) স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়ত, ভারতের বীমা শিল্পের দ্রুত, সুষম ও সুশৃঙ্খল বিকাশ ঘটানো। এর প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ:

ক) পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা

বীমা করার পর পলিসি গ্রাহক বা তার পরিবার যাতে বিপদের সময় সহজে ক্লেম (Claim Settlement) পান, তা

নিশ্চিত করা IRDAI-এর প্রধান কাজ। কোনো বীমা কোম্পানি যাতে পলিসির নিয়মাবলীর মারপ্যাঁচে ফেলে সাধারণ মানুষের বৈধ ক্লেম বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করতে না পারে, তার জন্য কড়া নিয়ম রয়েছে।

খ) বীমা কোম্পানিগুলোর লাইসেন্স ও নিবন্ধন

ভারতে জীবন বীমা (Life Insurance), স্বাস্থ্য বীমা (Health Insurance) বা সাধারণ বীমা (General Insurance) ব্যবসা শুরু করতে গেলে IRDAI-এর কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স নিতে হয়। কোম্পানিগুলোর আর্থিক সক্ষমতা (Solvency Margin) কেমন, তা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় যাতে তারা ভবিষ্যতে দেউলিয়া হয়ে গ্রাহকের টাকা ডুবিয়ে না দেয়।

গ) প্রবিধান ও আচরণবিধি তৈরি

বীমা এজেন্ট, ব্রোকার, লস অ্যাসেসর (Loss Assessors) এবং থার্ড পার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের (TPA) জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা এবং কঠোর আচরণবিধি নির্ধারণ করে IRDAI। পলিসি বিক্রি করার সময় গ্রাহককে কোনো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি বা ভুল তথ্য (Mis-selling) দেওয়া আইনত অপরাধ।

ঘ) গ্রামীণ ও সামাজিক ক্ষেত্রে বীমা প্রসার

ভারতের প্রত্যন্ত গ্রাম ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের কাছে যাতে বীমার আলো পৌঁছায়, তার জন্য IRDAI প্রতিটি বীমা কোম্পানির ওপর একটি নির্দিষ্ট কোটা বা লক্ষ্যমাত্রা (Rural and Social Sector Obligations) বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

বীমা ক্ষেত্রের প্রকারভেদ ও IRDAI-এর ভূমিকা

IRDAI মূলত দুটি প্রধান ধারার বীমা নিয়ন্ত্রণ করে:

১. জীবন বীমা (Life Insurance): মানুষের জীবনের ঝুঁকির বিপরীতে যে বীমা করা হয় (যেমন টার্ম ইন্সুরেন্স, এন্ডোমেন্ট প্ল্যান)।

২. সাধারণ বীমা (General Insurance): জীবন ব্যতীত অন্য সব কিছুর বীমা, যেমন- গাড়ি বা মোটরবাইক ইন্সুরেন্স (Motor Insurance), স্বাস্থ্য বীমা (Health Insurance), বাড়ি বা ফসলের বীমা (Crop Insurance)।

ভারতের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে IRDAI-এর অবদান

বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর পর থেকে ভারতের স্বাস্থ্য বীমা ক্ষেত্রে IRDAI অত্যন্ত মানবিক ও বৈপ্লবিক কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে:

স্ট্যান্ডার্ডাইজড পলিসি: সাধারণ মানুষ যাতে সহজে পলিসি বুঝতে পারেন, তার জন্য IRDAI সমস্ত কোম্পানির জন্য অভিন্ন নিয়মযুক্ত 'আরোগ্য সঞ্জীবনী' (Health) এবং 'সরল জীবন বীমা' (Life) পলিসি আনা বাধ্যতামূলক করেছে।

ক্যাশলেস ট্রিটমেন্ট ও প্রি-এক্সিস্টিং ডিজিজ: হাসপাতালে ভরতি হলে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা যাতে দ্রুত মেলে এবং পুরনো রোগ (Pre-existing diseases) থাকার অজুহাতে যাতে কোম্পানিগুলো পলিসি দিতে অস্বীকার না করে, তার সময়সীমা ও নিয়ম অনেক সহজ করে দিয়েছে এই সংস্থা।

পলিসি পোর্টেবিলিটি: মোবাইল নম্বরের মতোই, কোনো গ্রাহক যদি তার বর্তমান স্বাস্থ্য বীমা কোম্পানির পরিষেবাতে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি জমে থাকা বোনাস বা সুবিধা অক্ষুণ্ণ রেখেই অন্য কোম্পানিতে পলিসি পোর্ট

(Port) করতে পারেন।

বর্তমান সমস্যা সমুহ (Current Challenges)

কম বীমা অনুপ্রবেশ (Low Insurance Penetration): ভারতের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় বীমা করার হার (Insurance Penetration) এখনও অত্যন্ত কম। দেশের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে গ্রামীণ ভারতের মানুষ এখনও বীমাকে একটি প্রয়োজনীয় সুরক্ষা হিসেবে না দেখে 'টাকা নষ্ট' বা কেবল 'ট্যাক্স বাঁচানোর উপায়' হিসেবে দেখেন। এই মানসিকতার বদল ঘটানো বড়挑戰।

বীমা জালিয়াতি (Insurance Frauds): হাসপাতাল বা গ্রাহকদের একাংশ দ্বারা ভুয়া বিল বা মিথ্যে তথ্য জমা দিয়ে বীমা কোম্পানির কাছ থেকে টাকা হাতানোর ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। এই ধরণের আর্থিক জاليةতি রুখতে কঠোর নজরদারির প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়: অতিবৃষ্টি, খরা বা সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের বা সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ বীমা কোম্পানিগুলোর ওপর ক্লেম মেটানোর চাপ প্রচণ্ড বেড়ে যাচ্ছে, যা সামাল দিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন।

খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security) এবং গণবণ্টন ব্যবস্থা (Public Distribution System বা PDS)

যে কোনো প্রগতিশীল ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। বিশেষ করে ভারতের মতো একটি বিশাল জনসংখ্যা এবং বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কাঠামোর দেশে এই দুটি বিষয় কেবল মাত্র সরকারি নীতিমালার অংশ নয়, বরং তা কোটি কোটি মানুষের বেঁচে থাকার এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার একমাত্র উপায়।

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন তার প্রতিটি নাগরিক সুস্থ, সবল এবং উৎপাদনশীল হতে পারেন। আর এর প্রথম শর্ত হলো পর্যাপ্ত এবং পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান। ভারত বিগত কয়েক দশকে খাদ্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করলেও, উৎপাদিত খাদ্য দেশের প্রতিটি প্রান্তিক মানুষের থালায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এখনও বড় ধরনের পরিকাঠামোগত ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা এবং তার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গণবণ্টন ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক, গভীর এবং বিস্তারিত আলোচনা নিচে উপস্থাপন করা হলো।

১. খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা ও বহুমাত্রিক দিক

ঐতিহাসিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তাকে কেবল মাত্র দেশের ভেতরের খাদ্যশস্যের মজুত বা পর্যাপ্ত উৎপাদনের নিরিখে দেখা হতো। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানে এর সংজ্ঞা অনেক বেশি বিস্তৃত। ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে (World Food Summit) খাদ্য নিরাপত্তার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী: "খাদ্য নিরাপত্তা তখনই নিশ্চিত হয়, যখন সমস্ত মানুষের সব সময়ে একটি সুস্থ ও সক্রিয় জীবনযাপনের জন্য তাদের পছন্দসই পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যের ভৌত এবং অর্থনৈতিক নাগাল

থাকে।" এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান চারটি স্তম্ভ বা মাত্রা (Four Pillars of Food Security) সামনে আসে:

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা (Availability of Food)

এটি খাদ্য নিরাপত্তার প্রথম এবং প্রাথমিক ধাপ। এর অর্থ হলো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সমস্ত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য উপস্থিত থাকা। এটি মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে: দেশের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ কৃষি উৎপাদন। পূর্ববর্তী বছরগুলি থেকে জমিয়ে রাখা খাদ্যশস্যের সরকারি ও বেসরকারি মজুত (Buffer Stock)। দেশের উৎপাদন কম হলে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করার ক্ষমতা।

খ. খাদ্যের সহজলভ্যতা (Accessibility of Food)

কমবেশি দেশে প্রচুর খাদ্য উৎপাদন হলেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। যদি সেই খাদ্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে বা দরিদ্র শ্রেণির হাতের নাগালে না পৌঁছায়, তবে তা ব্যর্থ। খাদ্যের নাগাল পাওয়ার বিষয়টি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত:

ভৌত সহজলভ্যতা (Physical Access): দেশের প্রতিটি কোণায়, পাহাড়ি অঞ্চলে, দ্বীপ অঞ্চলে বা প্রত্যন্ত গ্রামে খাদ্য পরিবহণের উপযুক্ত পরিকাঠামো ও বাজার ব্যবস্থা থাকা।

অর্থনৈতিক সহজলভ্যতা (Economic Access): বাজারে খাদ্য উপলব্ধ থাকলেও তা কেনার মতো পর্যাপ্ত অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকা প্রয়োজন।

গ. খাদ্যের উপযোগিতা ও পুষ্টিগুণ (Utilization/Absorption of Food)

খাদ্য নিরাপত্তা কেবল পেট ভরানোর বিষয় নয়, এটি শরীরের পুষ্টির চাহিদাও পূরণ করার বিষয়। একজন মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করছেন, তা যেন সুষম ও পুষ্টিকর হয়। এর সাথে আরও কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় জড়িত:

পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্যতা।

উন্নত স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যাতে শরীর খাদ্য থেকে পুষ্টি উপাদানগুলি সঠিকভাবে শোষণ (Absorb) করতে পারে।

খাদ্য সুরক্ষার সঠিক জ্ঞান, যাতে খাদ্যের অপচয় বা খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট না হয়।

ঘ. স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতা (Stability)

উপরের তিনটি বিষয় (প্রাপ্যতা, নাগাল এবং উপযোগিতা) যেন সাময়িক না হয়ে বছরের ৩৬৫ দিনই বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করাই হলো স্থায়িত্ব। খরা, বন্যা, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা বা অতিমারির মতো আকস্মিক সংকটের সময়েও যেন দেশের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে না পড়ে, তার আগাম প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক।

২. ভারতে খাদ্য নিরাপত্তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তার ইতিহাস অত্যন্ত সংঘাতপূর্ণ এবং একই সাথে অনুপ্রেরণাদায়ক। এই ইতিহাসকে মূলত তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়:

স্বাধীনতার পর থেকে খাদ্য নিরাপত্তায় স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ভারতের যাত্রাপথকে মূলত তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়:

ক. প্রথম পর্যায়: স্বাধীনতার পরবর্তী সংকট ও পিএল-৪৮০ (১৯৪৭ - ১৯৬০-এর দশক)

স্বাধীনতার ঠিক পরপরই ভারতকে তীব্র খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। দেশভাগের ফলে উর্বর কৃষিজমির একটা বড় অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার কারণে দেশীয় উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম ছিল। এই সময়ে ভারতকে খাদ্যের জন্য মূলত আমেরিকার সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হতো, যা PL-480 (Public Law 480) চুক্তি নামে পরিচিত। এই পর্যায়টিকে ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত অপমানজনক 'শিপ-টু-মাউথ' (Ship-to-Mouth) বা জাহাজ থেকে সরাসরি মুখে যাওয়ার যুগ বলা হয়, যেখানে আমেরিকার গম বোঝাই জাহাজ বন্দরে পৌঁছানোর ওপর দেশের মানুষের আহার নির্ভর করত।

খ. দ্বিতীয় পর্যায়: সবুজ বিপ্লব এবং আত্মনির্ভরশীলতার যুগ (১৯৬০-এর দশকের মধ্যভাগ - ১৯৯০-এর দশক)

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে, যা সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) নামে পরিচিত। বিজ্ঞানী এম. এস. স্বামীনাথনের নেতৃত্বে এবং সরকারি সহায়তায় উচ্চ ফলনশীল বীজ (HYV), রাসায়নিক সার, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা এবং কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় (প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে)।

এর ফলে দেশ গম ও ধান উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে এবং আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ভারত খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠে। এই সময়েই খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মজুতের জন্য ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (FDI) এবং দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃষি মূল্য কমিশন (CACP) গঠিত হয়।

গ. তৃতীয় পর্যায়: অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আইনি স্বীকৃতি (২০০০ পরবর্তী সময়)

একবিংশ শতাব্দীতে এসে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা নীতিতে এক বড়সড় গুণগত পরিবর্তন ঘটে। খাদ্যকে কেবল একটি কল্যাণমূলক সরকারি অনুদান হিসেবে না দেখে, মানুষের 'মৌলিক অধিকার' (Right to Food) হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নির্দেশ এবং নাগরিক সমাজের আন্দোলনের পরিক্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে পাস হয় জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন (National Food Security Act - NFSA, 2013)। এর মাধ্যমে দেশের প্রায় ৭৫% গ্রামীণ এবং ৫০% শহুরে জনসংখ্যাকে অত্যন্ত কম মূল্যে আইনিভাবে খাদ্যশস্য পাওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে।

ভারতে গণবণ্টন ব্যবস্থা (Public Distribution System - PDS)-

রাজনৈতিক অর্থনীতিতে (Political Economy) PDS-এর পূর্ণরূপ হলো Public Distribution System বা জনসাধারণের বণ্টন ব্যবস্থা। এটি মূলত একটি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকার সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী (যেমন: চাল, গম, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি) বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে সরবরাহ করে। রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে, PDS শুধুমাত্র একটি খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি নয়; এটি রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক চরিত্র, সামাজিক নিরাপত্তা এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি একদিকে যেমন মুক্ত বাজারের একচেটিয়া প্রভাব ও অতিরিক্ত মুনাফাখোরি থেকে দরিদ্র জনগণকে রক্ষা করে, অন্যদিকে তেমনি সমাজে সম্পদের পুনঃবণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে সাহায্য করে।

রাজনৈতিক অর্থনীতিতে এই ব্যবস্থার গুরুত্বকে কয়েকটি মূল উপাদানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়:--খাদ্য নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State): PDS-এর মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদার অংশ হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। রাষ্ট্র যখন বাজার ব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা না করে নিজেই খাদ্য বণ্টনের দায়িত্ব নেয়, তখন তা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য স্থিতিশীলতা: মুক্ত বাজারে অনেক সময় ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। PDS-এর মাধ্যমে সরকার মজুত পণ্য বাজারে ছাড়ায় খোলা বাজারের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং মুদ্রাস্ফীতির হাত থেকে নিম্নবিত্তরা রক্ষা পায়।

কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে ভারসাম্য: এই ব্যবস্থার একটি বড় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক হলো, সরকার কৃষকদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (MSP) শস্য কেনে এবং তা PDS-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়। এর ফলে কৃষকরাও ন্যায্য মূল্য পায় এবং দরিদ্র ভোক্তারাও কম দামে খাবার পায়।

রাজনৈতিক অর্থনীতিতে PDS (Public Distribution System) বা জনসাধারণের বণ্টন ব্যবস্থা কেবল একটি প্রশাসনিক খাদ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া নয়; এটি রাষ্ট্র, সমাজ, এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্কের এক জটিল ও গতিশীল রূপ। মূলত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে (যেমন ভারত, বাংলাদেশ বা অন্যান্য সাব-সাহারা অঞ্চলের দেশ) এই ব্যবস্থাটি সামাজিক নিরাপত্তা, খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। নিচে রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে PDS-এর বহুমুখী গুরুত্ব, এর কার্যপদ্ধতি, চ্যালেঞ্জ, এবং সংস্কারের ওপর একটি বিস্তারিত ও বিশদ আলোচনা করা হলো।

১. রাজনৈতিক অর্থনীতি ও PDS: তাত্ত্বিক ভিত্তি ও রূপরেখা

রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy) মূলত আলোচনা করে কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক নীতি একে অপরকে প্রভাবিত করে। এই প্রেক্ষাপটে, PDS-কে দেখা হয় রাষ্ট্রের একটি "পুনঃবণ্টনমূলক নীতি" (Redistributive Policy) হিসেবে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে (Free Market Economy) পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও জোগানের নিয়মে। কিন্তু দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সেই বাজারে গিয়ে খাদ্য কেনার মতো পর্যাপ্ত ক্রয়ক্ষমতা থাকে না। বাজার যখন এই সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় (Market Failure), তখন রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। PDS হলো রাষ্ট্রীয়

হস্তক্ষেপের সেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, যার মাধ্যমে সরকার ধনীদের ওপর কর আরোপ করে বা অন্য কোনো খাত থেকে সংগৃহীত অর্থ ভর্তুকি (Subsidy) হিসেবে ব্যবহার করে দরিদ্রদের মাঝে সস্তায় খাদ্য বিতরণ করে।

এটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রকাঠামোর (Welfare State) একটি অন্যতম শর্ত। জন স্টুয়ার্ট মিল বা অমর্ত্য সেনের মতো অর্থনীতিবিদদের তত্ত্ব অনুযায়ী, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তখনই অর্থবহ হয় যখন তা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। ড. অমর্ত্য সেনের "Entitlement Theory" বা অধিকার তত্ত্বের সাথে PDS-এর গভীর সংযোগ রয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, দুর্ভিক্ষ বা খাদ্য সংকট কেবল খাদ্যের অভাবের কারণে হয় না, বরং খাদ্যের ওপর মানুষের অধিকার বা তা কেনার ক্ষমতা না থাকার কারণে ঘটে। PDS রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির মাধ্যমে নাগরিকদের সেই খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করে।

২. PDS-এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহ

রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে PDS-এর উদ্দেশ্যগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

ক) সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব পুঁজি গঠন (Social Security & Human Capital)

একটি দেশের বড় অংশ যদি অপুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তবে দীর্ঘমেয়াদে সেই দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। PDS-এর মাধ্যমে সস্তায় চাল, গম, বা ডাল সরবরাহ করার ফলে দরিদ্র পরিবারের পুষ্টির ন্যূনতম স্তর বজায় থাকে। এটি পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্য খাতের ওপর চাপ কমায় এবং শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার হার বৃদ্ধি করে (কারণ খাদ্য নিরাপত্তা থাকলে পরিবারগুলো শিশুদের শ্রমে না পাঠিয়ে শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিতে পারে)। ফলে এটি দীর্ঘমেয়াদে 'মানব পুঁজি' (Human Capital) গঠনে সহায়তা করে।

খ) বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য স্থিতিশীলতা (Market Regulation)

মুক্ত বাজারে অনেক সময় ফড়িয়া, মজুতদার বা বড় ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেয়। একে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে "Rent-seeking Behavior" বা অতিরিক্ত মুনাফাখোরি বলা হয়। যখন সরকারের কাছে PDS-এর জন্য বিশাল খাদ্য মজুত (Buffer Stock) থাকে, তখন সরকার বাজারের এই মনোপলি বা একচেটিয়া প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বাজারে দাম অস্বাভাবিক বাড়লে সরকার খোলা বাজারে খাদ্য ছেড়ে দাম কমিয়ে আনে, যা সাধারণ ভোক্তাকে মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) কোপ থেকে রক্ষা করে।

গ) কৃষি অর্থনীতির সুরক্ষা ও কৃষক-ভোক্তা ভারসাম্য :PDS ব্যবস্থাটি কেবল শহুরে বা গ্রামীণ দরিদ্র ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করে না, এটি সরাসরি গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির সাথে যুক্ত। সরকার সাধারণত কৃষকদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট দামে (যেমন ভারতে MSP - Minimum Support Price বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য) সরাসরি ফসল কেনে। এর ফলে:

কৃষকরা বাজারে বড় ব্যবসায়ীদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা পায়। তারা চাষাবাদের খরচের ওপর একটি নিশ্চিত মুনাফা পায়, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থপ্রবাহ বজায় রাখে। অন্যদিকে, এই সংগৃহীত খাদ্যই আবার PDS-এর মাধ্যমে কম দামে ভোক্তাদের দেওয়া হয়। অর্থাৎ, এটি একই সাথে উৎপাদক (কৃষক) এবং ভোক্তা (দরিদ্র জনগণ) উভয়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে।

৩. political tool হিসেবে PDS (PDS as a Political Tool)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে PDS-এর একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাজনৈতিক মাত্রা রয়েছে। নির্বাচনে জয়লাভ এবং জনসমর্থন ধরে রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়শই PDS-কে তাদের প্রধান নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে ব্যবহার করে।

ভোটব্যাংক ও বৈধতা (Legitimacy): সুলভে খাদ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সরাসরি প্রভাবিত করে। যে সরকার PDS সফলভাবে পরিচালনা করতে পারে, সমাজে তার রাজনৈতিক বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় একে "খাদ্য রাজনীতি" (Food Politics) বলা হয়।

সামাজিক অসন্তোষ ও বিপ্লব রোধ: ইতিহাস সাক্ষী যে, খাদ্যের সংকট এবং অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি বড় বড় সাম্রাজ্য ও সরকারের পতন ঘটিয়েছে (যেমন ফরাসি বিপ্লব বা আধুনিক যুগের আরব বসন্ত)। PDS সমাজের প্রান্তিক মানুষের পেটের ক্ষুধা নিবারণ করে চরম দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্যজনিত ক্ষোভ প্রশমিত রাখে, যা প্রকারান্তরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে ভারতের গণবণ্টন ব্যবস্থা বা রেশন ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সামাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে আসছে। এর বিবর্তনও কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে: ঐতিহ্যবাহী PDS (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৯৭): শুরুতে এটি ছিল একটি সার্বজনীন (Universal) ব্যবস্থা, যেখানে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল নাগরিককে রেশন দেওয়া হতো। তবে এতে সম্পদের অপচয় এবং প্রকৃত দরিদ্রদের বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ উঠত।

Targeted PDS বা TPDS (১৯৯৭ থেকে বর্তমান): ১৯৯৭ সালে সরকার এই ব্যবস্থাকে লক্ষ্যমুখী বা 'টার্গেটেড' করে তোলে। নাগরিকদের মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—BPL (দারিদ্র্যসীমার নিচে) এবং APL (দারিদ্র্যসীমার ওপরে)। পরবর্তীতে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY) চালুর মাধ্যমে অতিদরিদ্র পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে আরও সস্তায় খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

এক দেশ, এক রেশন কার্ড (One Nation, One Ration Card - ONORC): বর্তমান প্রযুক্তির যুগে পরিযায়ী শ্রমিকদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে দেশের যেকোনো প্রান্তের মানুষ নিজের আধার-সংযুক্ত রেশন কার্ড ব্যবহার করে যেকোনো সরকারি রেশনের দোকান থেকে তার প্রাপ্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারেন।

ভারতের গণবণ্টন ব্যবস্থার (PDS) প্রধান সমস্যা সমুহ:--

বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক হওয়া সত্ত্বেও, ভারতের গণবণ্টন ব্যবস্থা এখনও বেশ কিছু কাঠামোগত, প্রশাসনিক এবং প্রযুক্তিগত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জগুলিকে প্রধানত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. খাদ্যশস্যের অপচয় ও কালোবাজারি (Leakage and Diversion)

PDS ব্যবস্থার অন্যতম বড় দুর্বলতা হলো খোলা বাজারে খাদ্যশস্য পাচার বা কালোবাজারি। সরকারি গুদাম (FCI) থেকে রেশনের দোকান (FPS) পর্যন্ত পৌঁছানোর মাঝপথেই এক বিশাল পরিমাণ গম ও ধান খোলা বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রকৃত উপভোক্তার কাছে পৌঁছানোর আগেই একটি বড় অংশ দুর্নীতিগ্রস্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে চলে যায়।

খ. অনুপযুক্ত উপভোক্তা চিহ্নিতকরণ (Errors of Inclusion and Exclusion)

রেশন ব্যবস্থার সুবিধা কারা পাবেন, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি বড় ত্রুটি দেখা যায়:

Inclusion Error (অনুপযুক্তদের অন্তর্ভুক্তি): বহু বিত্তশালী বা সচ্ছল পরিবার ভুয়া নথির মাধ্যমে BPL বা অন্ত্যোদয় তালিকায় নাম তুলে রেশনের সস্তা চাল-গম ভোগ করছে।

Exclusion Error (প্রকৃত দরিদ্রদের বর্জন): উপযুক্ত পরিচয়পত্র, স্থায়ী ঠিকানা বা সচেতনতার অভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ অত্যন্ত দরিদ্র, আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষ রেশন কার্ডের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছেন।

গ. পরিকাঠামোগত অভাব ও ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণ (Inadequate Storage Infrastructure)

ভারতে প্রতি বছর কৃষকদের থেকে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ (Procurement) করা হয়, তা রাখার মতো পর্যাপ্ত এবং আধুনিক সায়লো বা কোল্ড স্টোরেজ নেই। ফলস্বরূপ, FCI-এর খোলা চত্বরে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য রোদ-বৃষ্টিতে পচে নষ্ট হয় অথবা ইঁদুর-পোকার খাদ্য হয়। একদিকে দেশের মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে, অন্যদিকে খাদ্যশস্য এভাবে নষ্ট হওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

ঘ. পুষ্টির উপাদানের অভাব (Monotonous Diet / Lack of Nutrition)

PDS ব্যবস্থায় মূলত চাল এবং গম বিতরণের ওপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়। এর ফলে মানুষের পেট ভরলেও শরীরে প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের (যেমন: আয়রন, ভিটামিন, জিঙ্ক) ঘাটতি থেকে যায়। ডাল, ভোজ্য তেল বা মিলেটসের (বাজরা, জোয়ার, রাগি) মতো পুষ্টিকর খাদ্যশস্য রেশন ব্যবস্থায় নিয়মিত না থাকায় তা দেশের সামগ্রিক কুষ্টির মান উন্নত করতে পারছে না।

ঙ. রেশনের ডিলারদের অনিয়ম ও কম কমিশন

অনেক ক্ষেত্রেই রেশন দোকানের ডিলারদের সরকারি কমিশন অত্যন্ত কম হওয়ায় তারা লাভের আসায় ওজনে

কম দেওয়া, নিম্নমানের খাদ্যশস্য সরবরাহ করা বা নির্দিষ্ট সময়ের আগে দোকান বন্ধ রাখার মতো অনৈতিক পথ বেছে নেন।

উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপ ও আধুনিকীকরণ

সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বিগত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি প্রযুক্তির সহায়তায় বেশ কিছু যুগান্তকারী সংস্কার এনেছে:

আধার সংযোগ ও বায়োমেট্রিক পদ্ধতি: রেশন কার্ডের সাথে আধার নম্বর যুক্ত করার ফলে কোটি কোটি ভুয়ো ও 'ভুতুড়ে' (Ghost) রেশন কার্ড বাতিল করা সম্ভব হয়েছে। রেশনের দোকানে e-PoS (Electronic Point of Sale) মেশিনের মাধ্যমে আঙুলের ছাপ বা চোখের মণি (Biometric) যাচাই করে তবেই খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে, যা দুর্নীতি অনেকটাই কমিয়েছে।

One Nation, One Ration Card (ONORC): পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে তাদের ওজনের কোটা অনুযায়ী রেশন তুলতে পারেন, তার জন্য এই জাতীয় পোর্টেবিলিটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

খাদ্যের পুষ্টিবর্ধন (Rice Fortification): অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা দূর করতে বর্তমানে রেশনের মাধ্যমে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ 'ফোর্টিফাইড চাল' (Fortified Rice) দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড মেশানো থাকে।

৭. ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ বা সমাধানের উপায় (Way Forward)

ভারতের খাদ্য নিরাপত্তাকে ১০০% নিশ্ছিদ্র করতে এবং PDS-কে আরও কার্যকর করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া জরুরি:

১. প্রযুক্তির শতভাগ ব্যবহার ও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ"।

খাদ্যশস্য বোঝাই ট্রাকগুলিতে জিপিএস (GPS) ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা এবং গুদাম থেকে দোকান পর্যন্ত ডিজিটাল ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করলে মাঝপথে খাদ্যশস্য চুরি হওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব।

২. শস্য বৈচিত্র্যকরণ (Nutritional Diversity)

রেশন তালিকায় কেবল চাল-গমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সস্তায় ডাল, সোয়াবিন, ভোজ্য তেল এবং বিশেষ করে মিলেটস (পুষ্টিকর দানাশস্য) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে দেশের 'লুকানো ক্ষুধা' (Hidden Hunger) বা অপুষ্টির সমস্যা দূর হবে।

৩. বিকেন্দ্রীকৃত সংগ্রহ ব্যবস্থা (Decentralized Procurement)

FCI-এর ওপর চাপ না কমিয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে সরাসরি স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে শস্য সংগ্রহ ও মজুতের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এতে পরিবহণ খরচ কমবে এবং স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

৪. পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলের মাধ্যমে দেশজুড়ে অত্যাধুনিক 'স্টিল সায়লো' (Steel Silos) এবং বৈজ্ঞানিক গুদামঘর নির্মাণ করতে হবে, যাতে একটি দানাও পচে নষ্ট না হয়।

৫. ক্যাশ ট্রান্সফার বা ফুড কুপনের পাইলট প্রজেক্ট

যেসব শহরাঞ্চলে পরিকাঠামো ভালো, সেখানে রেশন ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে সরাসরি উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো (Direct Benefit Transfer - DBT) অথবা ডিজিটাল ফুড কুপন দেওয়ার বিষয়টি আরও বড় আকারে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

খাদ্য নিরাপত্তা কেবল একটি নীতি নয়, এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতীক। ভারতের গণবণ্টন ব্যবস্থা বিগত কয়েক দশকে কোটি কোটি মানুষকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচিয়েছে এবং অতিমারির সময়েও দেশের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে। তবে একে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করতে হলে প্রশাসনিক সদিচ্ছা, কঠোর নজরদারি এবং প্রযুক্তির সঠিক মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। তবেই ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য "খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার" কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবে রূপায়িত হবে এবং দেশ একটি ক্ষুধা-মুক্ত, সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমঞ্চে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

GST AND FISCAL FEDERALISM

Fiscal Federalism বা আর্থিক ফেডারেলিজম হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কর আরোপ, রাজস্ব সংগ্রহ এবং সরকারি ব্যয়ের ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়। ভারত একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হওয়ায় এখানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতা রয়েছে। সংবিধানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে কোন ধরনের কর কেন্দ্র আদায় করবে এবং কোন ধরনের কর রাজ্য আদায় করবে। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো এবং উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখা। কেন্দ্রের তুলনায় রাজ্যগুলোর ব্যয়ের দায়িত্ব বেশি হলেও তাদের আয়ের উৎস তুলনামূলকভাবে সীমিত। তাই কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিকে করের অংশ এবং অনুদান দেওয়া হয়, যা Fiscal Federalism-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

ভারতের Fiscal Federalism কাঠামোতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো Finance Commission of India। এই কমিশন প্রতি পাঁচ বছরে গঠিত হয় এবং কেন্দ্রের কর রাজ্যগুলোর মধ্যে কীভাবে বণ্টন করা হবে সে বিষয়ে সুপারিশ করে। এর মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্র রাজ্যের মধ্যে আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। ভারতের মতো বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় দেশে Fiscal Federalism অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিভিন্ন রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা, জনসংখ্যা, শিল্পোন্নয়ন এবং প্রশাসনিক প্রয়োজন ভিন্ন।

GST বা Goods and Services Tax হলো একটি একীভূত পরোক্ষ কর ব্যবস্থা যা ভারতে ১ জুলাই ২০১৭ সালে চালু হয়। GST চালুর আগে দেশে বিভিন্ন ধরনের পরোক্ষ কর যেমন VAT, Service Tax, Excise Duty, Entry Tax ইত্যাদি চালু ছিল। এই বহুস্তরীয় কর ব্যবস্থা ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করত এবং একই পণ্যের উপর একাধিকবার কর আরোপ হতো। GST এই সব করকে একত্রিত করে একটি সমন্বিত কর কাঠামো তৈরি করেছে। এর ফলে “One Nation, One Tax” ধারণা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সমগ্র ভারত একটি একক বাজারে পরিণত হয়েছে।

GST মূলত value-added tax পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। অর্থাৎ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রতিটি ধাপে শুধুমাত্র অতিরিক্ত মূল্য সংযোজনের উপর কর আরোপ করা হয়। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো Input Tax Credit ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা আগের ধাপে প্রদত্ত কর পরবর্তী ধাপে সমন্বয় করতে পারে। ফলে করের উপর কর বা cascading effect কমে যায়। GST একটি destination-based tax, অর্থাৎ যেখানে পণ্য বা সেবা শেষ পর্যন্ত ভোগ করা হবে সেই রাজ্য করের অংশ পাবে। এই ব্যবস্থা রাজ্যগুলোর মধ্যে কর বণ্টনের নতুন ধারা তৈরি করেছে।

GST ব্যবস্থায় তিন ধরনের কর রয়েছে—CGST, SGST এবং IGST। একই রাজ্যের মধ্যে পণ্য বা সেবা বিক্রির ক্ষেত্রে করের একটি অংশ কেন্দ্র পায়, যাকে CGST বলা হয়, এবং অন্য অংশ রাজ্য পায়, যাকে SGST বলা হয়। অন্যদিকে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্য বা সেবা বিক্রি হলে IGST আরোপ করা হয়, যা পরে কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এই কাঠামো কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং Fiscal Federalism-এর একটি নতুন রূপ সৃষ্টি করে।

GST ভারতের Fiscal Federalism-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে কারণ এটি কর ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। GST চালুর ফলে রাজ্যগুলো তাদের অনেক স্বাধীন কর আরোপের ক্ষমতা হারিয়েছে এবং এখন কর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যৌথভাবে নেওয়া হয়। এই যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য GST Council গঠন করা হয়েছে। এই কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সদস্য হিসেবে থাকেন। GST rate নির্ধারণ, কর কাঠামো পরিবর্তন এবং নতুন নীতি প্রণয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখানেই নেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাকে Cooperative Federalism-এর অন্যতম প্রধান উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়।

তবে GST নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনাও রয়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে GST রাজ্যগুলোর আর্থিক স্বাধীনতা কমিয়ে দিয়েছে কারণ তারা এখন আর স্বাধীনভাবে করের হার পরিবর্তন করতে পারে না। এছাড়া GST compensation নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধও দেখা গেছে, বিশেষ করে COVID-19 মহামারির সময়। ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও GST compliance এবং online filing-এর জটিলতা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অনেকের মতে, এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি, ফলে Fiscal Federalism কিছুটা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে।

সার্বিকভাবে GST ভারতের Fiscal Federalism-কে নতুন কাঠামো দিয়েছে। এটি একদিকে কর ব্যবস্থাকে সহজ ও আধুনিক করেছে, অন্যদিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের নতুন মাত্রা তৈরি করেছে। GST ভারতের অর্থনৈতিক ঐক্য জোরদার করেছে এবং সমগ্র দেশকে একটি সমন্বিত বাজারে পরিণত করেছে। তবে একই সঙ্গে এটি রাজ্যের আর্থিক স্বায়ত্তশাসন এবং কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে নতুন বিতর্কও সৃষ্টি করেছে। তাই GST-কে একদিকে Cooperative Federalism-এর সফল উদাহরণ বলা হলেও অন্যদিকে এটিকে আংশিক কেন্দ্রীভূত আর্থিক কাঠামো হিসেবেও বিশ্লেষণ করা হয়।

Climate change and Development

Climate change বা জলবায়ু পরিবর্তন বলতে পৃথিবীর দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়াগত পরিবর্তনকে বোঝায়, যার ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের ধরণে পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাকৃতিক কারণেও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু বর্তমান সময়ের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো মানবসৃষ্ট কার্যকলাপ। শিল্পায়ন, জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার, বন উজাড়, নগরায়ণ এবং দূষণের ফলে বায়ুমণ্ডলে greenhouse gases যেমন carbon dioxide, methane এবং nitrous oxide-এর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গ্যাসগুলো পৃথিবীর তাপ আটকে রেখে global warming সৃষ্টি করছে, যা climate change-এর মূল কারণ।

Development বা উন্নয়ন বলতে সাধারণত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে বোঝায়। উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি এবং দারিদ্র্য হ্রাস সম্ভব হয়। তবে আধুনিক উন্নয়নের অধিকাংশ মডেল দীর্ঘদিন ধরে প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং পরিবেশ দূষণের উপর নির্ভর করেছে। শিল্পকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ব্যবস্থা এবং নগরায়ণ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করলেও একই সঙ্গে পরিবেশের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

Climate change এবং development-এর সম্পর্ক দ্বিমুখী। একদিকে উন্নয়নের প্রচলিত পদ্ধতি জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন উন্নয়নের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করছে। শিল্পোন্নত দেশগুলো কয়েক শতাব্দী ধরে ব্যাপকভাবে কয়লা, তেল ও গ্যাস ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। এর ফলে greenhouse gas emissions অত্যন্ত বেড়েছে এবং বর্তমান জলবায়ু সংকট সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর উপর, যাদের পরিবেশগত ক্ষতি মোকাবিলার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম। এই বৈষম্য আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও পরিবেশ আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সরাসরি প্রভাবিত করছে। কৃষিক্ষেত্রে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং খরার কারণে উৎপাদন কমে যাচ্ছে। অনেক অঞ্চলে পানির সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ভূমি ক্ষয়, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং মানুষের বাস্তুচ্যুতি ঘটছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও climate change গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করছে, কারণ অতিরিক্ত তাপপ্রবাহ, বায়ুদূষণ এবং নতুন রোগের বিস্তার মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। এসব কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Climate change সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষ ঘরবাড়ি হারায়, জীবিকা নষ্ট হয় এবং বাধ্য হয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে হয়। এর ফলে climate refugees বা জলবায়ু উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। নারী, শিশু, কৃষক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ তাদের অভিযোজন ক্ষমতা কম। শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে climate change শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক সংকটেও পরিণত হয়েছে।

উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য Sustainable Development ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। Sustainable Development বলতে এমন উন্নয়নকে বোঝায় যা বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করবে কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের সক্ষমতাকে নষ্ট করবে না। এই ধারণা পরিবেশ সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক

উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের উপর জোর দেয়। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, বন সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা sustainable development-এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

Climate change মোকাবিলার জন্য দুটি প্রধান কৌশল হলো mitigation এবং adaptation। Mitigation-এর উদ্দেশ্য হলো greenhouse gas emissions কমানো এবং global warming নিয়ন্ত্রণ করা। এর মধ্যে রয়েছে renewable energy ব্যবহার, energy efficiency বৃদ্ধি, electric vehicle-এর ব্যবহার এবং বনায়ন। অন্যদিকে adaptation-এর উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। যেমন—বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা, খরা সহনশীল কৃষি, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য adaptation বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা climate change-এর প্রভাবে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে climate change মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন চুক্তি ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। United Nations Framework Convention on Climate Change এবং Paris Agreement বিশ্বব্যাপী climate governance-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। Paris Agreement-এর মূল লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা শিল্পপূর্ব সময়ের তুলনায় 2°C-এর নিচে সীমাবদ্ধ রাখা এবং সম্ভব হলে 1.5°C-এর মধ্যে রাখা। উন্নত দেশগুলোকে emissions কমানোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়ার কথাও এখানে বলা হয়েছে।

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে climate change এবং development-এর সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত একদিকে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতেও রয়েছে। কৃষি, পানি, স্বাস্থ্য এবং উপকূলীয় অঞ্চল climate change-এর কারণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। তাই ভারত renewable energy, solar power, electric mobility এবং green development-এর উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। একই সঙ্গে উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ভারতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সার্বিকভাবে climate change এবং development একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। অপরিকল্পিত উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে, আবার জলবায়ু পরিবর্তন উন্নয়নের অর্জনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই বর্তমান বিশ্বে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে দেখা যায় না; পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং সামাজিক ন্যায়বিচারও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের উন্নয়নকে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশবান্ধব হতে হবে, যাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর পরিবেশ ও মানবসমাজও সুরক্ষিত থাকে।

PROPERTY AND INEQUALITY

Poverty বা দারিদ্র্য এবং inequality বা বৈষম্য আধুনিক বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। দারিদ্র্য বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে মানুষ তার মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্যদিকে inequality বলতে সমাজে আয়, সম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধার অসম বণ্টনকে বোঝায়। এই দুটি ধারণা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত, কারণ সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি পেলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরও বেশি পিছিয়ে পড়ে এবং উন্নয়নের সুফল সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছায় না। তাই poverty এবং inequality শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, এগুলো সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

দারিদ্র্যকে সাধারণত absolute poverty এবং relative poverty এই দুইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। Absolute

poverty হলো এমন অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি ন্যূনতম খাদ্য ও জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ করতেও সক্ষম নয়। আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বব্যাংক একটি নির্দিষ্ট আয়ের সীমার মাধ্যমে extreme poverty নির্ধারণ করে। Relative poverty হলো সমাজের অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে থাকার অবস্থা। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি হয়তো জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে, কিন্তু সমাজের গড় জীবনযাত্রার মানের তুলনায় অনেক নিচে অবস্থান করছে। উন্নত দেশগুলোতে relative poverty-এর গুরুত্ব বেশি, কারণ সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বড় সমস্যা হিসেবে দেখা হয়।

দারিদ্র্যের কারণ বহুমাত্রিক। বেকারত্ব, অশিক্ষা, কম মজুরি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দুর্বল অবকাঠামো, সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এবং সীমিত শিল্পায়নের কারণে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না। অনেক মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কম আয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবার অভাব, অপুষ্টি এবং দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। যুদ্ধ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং climate change-এর মতো কারণও দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে কারণ এসব পরিস্থিতিতে মানুষের জীবিকা ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়।

Inequality বা বৈষম্যের ক্ষেত্রও বহুমাত্রিক। আয় ও সম্পদের বৈষম্য সবচেয়ে বেশি আলোচিত হলেও এর পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, gender, caste, race এবং অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্যও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দেশে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ অধিকাংশ সম্পদের মালিক, অন্যদিকে বৃহৎ জনগোষ্ঠী সীমিত সম্পদ নিয়ে জীবনযাপন করে। শিক্ষা ও প্রযুক্তির অসম প্রবেশাধিকার মানুষের সুযোগের সমতা নষ্ট করে। নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রায়ই বৈষম্যের শিকার হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত থাকে। ফলে inequality সামাজিক বিভাজন ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

বিশ্বব্যাপী poverty-এর trend বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গত কয়েক দশকে extreme poverty উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। বিশেষ করে চীন, ভারত এবং পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা World Bank এর তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯০-এর দশকের তুলনায় বর্তমানে extreme poverty-এর হার অনেক কম। তবে COVID-19 pandemic, যুদ্ধ এবং climate change-এর কারণে সাম্প্রতিক সময়ে আবার অনেক মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছে। বিশেষ করে

আফ্রিকার অনেক দেশে এখনও দারিদ্র্যের হার অত্যন্ত বেশি এবং খাদ্য নিরাপত্তা একটি বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

ভারতের ক্ষেত্রে poverty trend-এ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের একটি বড় জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত। কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কার, শিল্পায়ন, পরিষেবা খাতের সম্প্রসারণ এবং সরকারি কল্যাণমূলক কর্মসূচির ফলে দারিদ্র্যের হার ধীরে ধীরে কমেছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং সরাসরি নগদ সহায়তা দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সাহায্য করেছে। তবুও আঞ্চলিক বৈষম্য, বেকারত্ব এবং অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজারের কারণে এখনও বিপুল জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

Inequality-এর trend বিশ্বব্যাপী উদ্বেগজনক। যদিও অনেক দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেই প্রবৃদ্ধির সুফল সমানভাবে বণ্টিত হয়নি। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়ের ব্যবধান ক্রমাগত বেড়েছে। Globalization এবং technological advancement-এর ফলে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ ও বড় কর্পোরেশন বেশি লাভবান হয়েছে, কিন্তু অদক্ষ শ্রমিক ও ছোট উৎপাদকরা পিছিয়ে পড়েছে। অনেক দেশে middle class দুর্বল হয়েছে এবং wealth concentration খুব অল্প সংখ্যক মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ঝুঁকি বাড়িয়েছে।

ভারতের ক্ষেত্রেও inequality-এর trend উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও আয় ও সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি

পেয়েছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে, skilled ও unskilled workers-এর মধ্যে এবং ডিজিটাল access-এর ক্ষেত্রেও বড় পার্থক্য দেখা যায়। উচ্চ আয়ের মানুষের সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর উন্নতি তুলনামূলক ধীর। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানেও বৈষম্য স্পষ্ট। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে ভারতের উন্নয়ন inclusive হলেও সম্পূর্ণ equitable নয়।

দারিদ্র্য ও বৈষম্য সামাজিক উন্নয়নের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রায়ই অপুষ্টি, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং বেকারত্বের শিকার হয়। শিশু শ্রম, নারী নির্যাতন এবং অপরাধের হারও দারিদ্র্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৈষম্য মানুষের মধ্যে অসন্তোষ, সামাজিক বিভাজন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। যখন মানুষ মনে করে যে উন্নয়নের সুফল কেবল নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আস্থা কমে যায়। তাই poverty এবং inequality শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সূচক নয়; এগুলো সামাজিক স্থিতিশীলতা ও মানবিক মর্যাদার সঙ্গেও সম্পর্কিত।

দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমানোর জন্য inclusive development অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, social security এবং skill development-এর উপর জোর দিতে হয়। Progressive taxation, minimum wage policy এবং welfare schemes inequality কমাতে সহায়ক। নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং ডিজিটাল access বৃদ্ধি করাও গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে sustainable development নিশ্চিত করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে United Nations এর Sustainable Development Goals-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো poverty eradication এবং reduced inequalities। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাসে কিছু অগ্রগতি হলেও inequality এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। ভবিষ্যতের উন্নয়নকে আরও inclusive, sustainable এবং equitable করতে না পারলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই poverty এবং inequality মোকাবিলা করা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান উন্নয়নমূলক লক্ষ্য।